অশ্রু রক্ত স্বপ্ন

'হোন দাৎ' উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ

আও তুক

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

অনুবাদক ঃ **ভবানী মুখোপাধ্যায়**

প্রকাশক ঃ ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ ঃ রবীন দত্ত

মুদ্রাকর ঃ রঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

ছয় টাকা

ভূমিকার পরিবর্তে

অনেক বছর লড়াই করে দক্ষিণ-ভিয়েৎনামের মানুষ অনন্যসাধারণ বিজয়গর্বের অধিকারী হয়েছে।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণ এবং সর্বদেশের প্রগতিশীল জনসমাজ আজ আমাদের দিকে নজর রেখেছে। এটা সহজবোধ্য, কারণ আমাদের দেশের অর্ধেক মানুষ ঔপনিবেশিক শাসনের চাপে থেকে একটা প্রচণ্ড সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে লড়ছে। সেই শক্তিকে তারা ব্যাহত করেছে দৃঢ় মনোবল এবং দুর্দমনীয় আত্মশক্তির প্রভাবে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সব অঞ্চলে সব নদীতে, সব পাহাড়ে, গ্রামে-নগরে, প্রতিটি মানুষের পিছনে আছে বীরত্বের ইতিহাস। এই বীরত্ব কাহিনীর যে কোনো একটির দ্বারাই চোদ্দ মিলিয়ন দক্ষিণ ভিয়েৎনামী জনগণের চরিত্রবিচার সম্ভব।

হোন দাং গ্রামাঞ্চলে ১৫০০ মার্কিন সেনা আপাদমস্তক রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে গ্রামের মানুষের সঙ্গে মাত্র দশদিন সংগ্রাম করে হটে গেছে। এই সংঘর্ষের শামিল হয়েছিলেন মাত্র উনিশজন দক্ষিণ-ভিয়েৎনামী, তাঁদের মাবার তিনজন মহিলা ও দুটি সাত ও তের বছরের শিশু।

আঙ ডুক তাঁর উপন্যাসে আদর্শের জন্য লড়াই-এর এই কাহিনী অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কারণেই হোন দাং অঞ্চলটি স্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯৬১র স্বতোৎসারিত অভ্যুত্থানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। আঙ ডুক অঙ্কিত চরিত্রাবলীর অনেকে আজো জীবিত।

এই উপন্যাসের ত্রুটিও আছে তথাপি "হোন দাং" এক অসাধারণ বাস্তবানুগ কাহিনী মহৎকাব্যের উপজীব্য ঘটনাবলী নিয়ে একটি এপিক উপন্যাস রচনা করেছেন আঙ ডুক। তাই যখন সমগ্র ভিয়েৎনামের মানুষ দেশ থেকে বিদেশী প্রভাব বিতাড়নের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন এই স্বদেশপ্রেমের কাহিনী বিশেষ অনুপ্রেরণাময় বিবেচিত হবে।

আঙ ডুককে ধন্যবাদ।

ত্রাণ বাক দাং

মেম্বর অব দি প্রেসিডিয়াম অব দি সেন্ট্রাল কমিটি অব দি ন্যাশনাল ফ্রন্ট ফর লিবারেশন,
চেয়ারম্যান অব দি সাউথ ভিয়েৎনাম ইউনিয়ন অব আর্টস অ্যাণ্ড লেটার্স

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের বই

উপন্যাস

অগ্নিরথের সারথি
কান্নাহাসির দোলা
একাকিনী নায়িকা
স্বর্গ হইতে বিদায়
কালো রাত

ছোটগল্প

বনহরিণী
চন্দ্রমল্লিকা
সেই মেয়েটি
নির্জন গৃহকোণে
যথা পূর্বং

জীবনী

জর্জ বার্নাড শ
অস্কার ওয়াইলড
বিশ্বসাহিত্যের লেখক

অনুবাদ

রেজর্স এজ
বিপ্লবী যৌবন
বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনের আত্মজীবনী
পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে
ওয়ান ওয়ার্লড
মাদার রাশিয়া
বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠগল্প

এক

কোয়েন তার বোন সু-কে বলছিল—কেমন তোকে বলিনি আমি। ও তোকে নিশ্চয়ই ভোলেনি। চিঠিটায় কি আবেগ দেখেছিস! মনে রাখিস এটা তার আঠারো নম্বর চিঠি। এইটুকুই মনে রাখার মত কথা। ভেবে দেখ ঈশ্বর জানেন, কি যে ব্যাপার। এখন ত সব স্পষ্ট হয়ে গেল, ওর লেখা সব চিঠিই হারিয়ে গেছে। যখন উত্তরাঞ্চল আমাদের ছিল তখন সেই সাত বছরের ভেতরেই এই কাণ্ড ঘটে গেছে। ও ভাবলেও মাথা খারাপ হয়ে যায়। যাক গে, তোর স্বামীব চিন্তা শেষ হল এতদিনে, কি বলিস রে সু।···এতদিন তো খালি বলে এসেছিস ওখানকার সাতশো মজার ভেতর আমাদের কথা ভাবার আর সময় কোথায়—বল না, আমি বলিনি—? এখন স্বীকার করবি তো তোর ভুল হয়েছে এতদিন?

কোয়েন উচ্ছ্বসিত হয়ে সমানে বকে চলেছে, তার কণ্ঠস্বরে যেন আনন্দ ঝরে পড়ছে। ভগ্নিপতির সমর্থনে যে এই উচ্ছ্বাস তা নয়, তার আনন্দের প্রধান কারণ হল এই যে সাত বছর লেখালেখির পর এই এতদিনে সু-ব চিঠির জবাব এসেছে। তাই সে আজ বোনের এই আনন্দের শরিক। এ আনন্দ নিয়ে মনে মনে নূপুরের জাল বোনা যায়। কোয়েনের চকচকে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে ঠোঁট ছুটি দাঁত দিয়ে চেপে ধরছে আর মিষ্টি ভঙ্গীতে হাত নেড়ে কোয়েন তার প্রতিটি কথার ওপরে জোর দিচ্ছে।

ভগ্নিপতির ফোটোখানি নিজের কাছে রেখে বোনকে চিঠিখানি ফেরত দিয়ে কোয়েন দ্রুত পায়ে বারান্দা বেয়ে চলল। সিঁড়ির কাছে লুকিয়ে একটা ছবি দেখছিল থুয়া। কোয়েন তাকে কোলে চেপে ধরে বলল—ভাল করে দেখ, তারপর মাসিমণিকে বলতো কে ইনি?

মেয়েটি ছু চোখ ভরে ছবিটি দেখে নিয়ে বলে ওঠে, বাবে, এই তো বাপি! হ্যাঁ,—নিশ্চয়ই আমার বাবা।

—কি করে জানলি?

—মামণি বলেছে যে।

তারপর বড় বড় চোখ ছুটি মাসির দিকে মেলে সংশয় ভরা ভঙ্গীতে প্রশ্ন করে, বল না মাসিমণি, ঠিক বলেছি কিনা, বল না।

বাচ্চা থুয়াকে কোয়েন বুকে চেপে ধরে তারপর মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ—মিঠুমা, তুমি ঠিকই বলেছ! এখন থেকে মনে থাকবে তো তোমার বাপিকে কেমন দেখতে। তুমি আর তোমার বাবা, দুজনের জানাশোনা হয়ে গেল, কেমন।

তারপর বোনের দিকে তাকিয়ে বলে, সান-এর চিঠিতে জানা গেল সে তোর শেষ চিঠি আর থুয়ার সঙ্গে তোলা ছবিটা পেয়েছে। ভেবে ছাখ সু, তোর স্বামী সাত বছর পরে শেষে জানল নিজের মেয়েটাকে কেমন দেখতে।

কোয়েন স্নেহভরে বোনঝির কপালে হাত বেখে বলে, হ্যাঁ, সাত বছর পরেই তোমার বাপি তোমাব এই সোনা মুখ দেখতে পেল। যখন উনি চলে গেলেন, তখনও তুমি জন্মাও নি। বুঝলে?

যেন গতকালের ঘটনা। সুর মনে পড়ে উত্তরাঞ্চলে পুনর্বিন্যাসের কাজে যাওয়ার আগে অল্প ক'দিনের ছুটিতে স্বামী ওর কাছে এসে ক'দিন একত্র কাটিয়েছিলেন।

এই বাড়িতেই ছাতা ধরা মেঝেতে গা মেলে দিয়ে শুয়ে পড়ে সদাহাস্যময় সান বিদায়ের ক্ষণটির জন্য অপেক্ষা করেছে। বাইরের সেই শান্ত ভঙ্গির পিছে ওর মনে কি যে হচ্ছিল তা সেদিন শুধু সুই বুঝতে পেরেছিল। যদিও গ্রামের সবাইকে বলেছিল—দু বছর, কি আর এমন! কিন্তু শেষ রাত্রিটিতে কি যে তার মনের ভিতর ছিল তা সান স্ত্রীকে জানিয়েছিল।—

ওগো শুনছ, পাছে মার মনে কষ্ট হয় এই ভেবে আমি দু বছর বলেছি, তবে তোমাকে বলছি এটা একেবারে খাঁটি সত্যি নয়। এক বছরেই আবার শুরু হয়ে যেতে পারে। আর তারপর দুই, তিন,

চার, পাঁচ বছর কেটে যেতে পারে। আমরা একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা পড়তে চাই না।

এখন অনেক রাত। স্ত্রীর মাথাটি নিজের কাঁধের ওপরে রেখে সামান্য এক মুহূর্ত নীরব থেকে প্রায় স্বগতোক্তি করেছিল সান্‌, কি জানি আমাদের এখানে যত রকমের ফল আছে ওখানে তেমন আছে কিনা। আম আছে কি? গাব গাছ? বাতাবি লেবু—? জানি না ঠিক কোন সময়ে ওখানে বাতাবি লেবুর ফুল ফোটে। হয়ত এখানকার মত 'টেট' (চান্দ্রমাসানুযায়ী বসন্ত ও নববর্ষ উৎসব) উৎসবের সময়ও নয় ওখানে।

প্রথমটায় সু মনে করেছিল ওর চলে যাওয়ার ব্যাপারটা এড়ানোর জন্যই এইসব কথার অবতারণা। কিন্তু সহসা সে বুঝলো ঠিক কি বলতে চায় সান. এইসব সাদাসিধে কথার পিছনে কি বাণী প্রচ্ছন্ন আছে। দু বছর আগে লঙ চুয়া হা-র সামরিক অভিযানের দিনে তাদের সম্মানে একটা পার্টি দেওয়া হয়েছিল, সেই পার্টিতেই সান ওকে প্রথম দেখেছিল। সু সেই ভোজসভার টেবলে খাদ্য পরিবেশন করছিল।

পরে সান স্বীকার করেছে বোধ হয় ওর নিবিড় কেশদাম আর চুলে ব্যবহৃত সেই বাতাবি লেবুফুলের গন্ধই ওকে প্রথম আকৃষ্ট করেছিল। এই পার্টির সেই প্রথম দেখার কথা ওরা কোনদিন ভুলবে না। তার পর একদিন দুজনে দেখা হয়ে গেল, আশপাশে আর কেউ ছিল না, হেসে অতি মৃদু গলায় সান সেদিন প্রশ্ন করেছিল—তুমি সেই বাতাবি লেবুফুলের গন্ধ আর ব্যবহার কর না?

আর সু ভ্যাবাচাকা খেয়ে লজ্জায় লাল হয়ে উঠে হাসি চাপতে গিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরল।

ওদের কাহিনীর সেই সূত্রপাত। চতুর্দিকে অজস্র সামরিক বিজয় উৎসবের মধ্যে ওদের প্রেম মুঞ্জরিত হয়ে উঠল—সেই সময় হোন দাং

পল্লীতে বাতাবি লেবুর ফুল ফোটার সময়—লেবু ফুলের সেই মাদকতাভরা সৌরভ দুজনকে ঘিরে রইল।

এরই দু বছর পরে ওদের বিয়ে হয়ে গেল। সেই সময় ছিল ঞ্জিয়েন বিয়েন ফুর বিরাট বিজয় উৎসবের কাল, সেই বিয়ে এই অঞ্চলের সব চেয়ে চমকপ্রদ বিবাহ অনুষ্ঠান।

এরপর দুজনে মাত্র এক মাস একত্রে থাকতে পেরেছিল। তারপর —সাত বছরেরও বেশী কাল অতিক্রান্ত। আর এই মাত্র আজ অতি সংক্ষিপ্ত একটি পত্র মারফৎ সু তার স্বামীর সংবাদ পেল। আর এই চিঠির ভিতর পেয়েছে তার মধুর মুখেব একটি ছোট্ট ফটো।

সাত বছর! এক দীর্ঘ সময়। কেমন যেন অবাস্তব মনে হয়। সে সবিস্ময়ে বলে, কিভাবে সময় কেটে যায়! এর মধ্যে সাত বছর!

কোয়েন বলে, কিন্তু আমার মনে হয়, ও কিছুতেই বুঝতে পারবে না, আমাদের ওপর দিয়ে কি গেছে! ও যদি জানতে পারে যে ওর নামে নিন্দাবাদ করে একটি বিবৃতি সই করানোর জন্য তোর ওপর কি চাপ দিয়েছিল ওরা, তারপর 'বাঘের খাঁচা', 'কুমীরের গহ্বর' আরো সব কত কি? ও যদি জানতো রে—!

—ও আর কি করে এ সব জানবে বলো! সু মৃদু হেসে বলে— হয়ত লোকের মুখে এমন সব কাণ্ড যে ঘটে তা শুনেছে, কিন্তু আসল সত্যিটা জানবে কি করে!

থুয়া ওদের এই সংলাপের সুযোগ নিয়ে কোয়েনের হাঁটু বেয়ে নেমে এসে তার মার ছোট্ট সেলাই-এর বাক্সটার কাছে গেল। তার ভিতর থেকে একটা ছোট্ট আয়না বার করে নিয়ে বিছানার ওপর গিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে দীর্ঘকাল নিজের আকৃতি দেখতে থাকে। তারপর হাতের মুঠি খুলে বাপের ছবিটির দিকে তাকায়। আবার আয়নায় নিজের মুখটা দেখে। প্রতিটি খুঁটিনাটি মেলায়, চোখ, মুখ, কান—কি কি সাদৃশ্য আছে মেলানোর চেষ্টা করে। চোখ আর ভ্রূতে তেমন মিল নেই। ওর চোখ গোল গোল, বাবার চোখ

টানা টানা—বাবার ভ্রূ বেশ ঘন। কিন্তু কি মজা!—কোনো সন্দেহ নেই—নাক আর মুখে একেবারে এক রকম। আনন্দে বুকটা দুপ্ দুপ্ করে, মেয়েটি চোখ খুলে বাপের সঙ্গে তার আর কি কি মিল আছে দেখার চেষ্টা করে। বাবাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, যেদিন থেকে শুনেছে যে তার একজন বাবা আছে, একেবারেই নিজের, সেদিন থেকে তার মনে হয়েছে যে বাবাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসবে। সহসা তার মনে হল যে তাঁর কাছ থেকে যা কিছু আসছে তাই বিস্ময়ের বস্তু; আর বাবাও নিশ্চয়ই পৃথিবীর আর সব কিছুর চেয়ে ওকেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন। আজ সকালে মা যখন ফটো হাতে বলেছেন, এই তোব বাবা, তখনই সে বিশ্বাস করেছে। মা কখনও ওর কাছে মিথ্যা বলেন নি, সেটা একটি কারণ। আর সব চেয়ে বড় কারণ, ছবিটার দিকে তাকিয়ে মনে হয় অনেক আগেই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। অথচ আগে আগে মার মুখে বাবাকে কেমন দেখতে তা শুনেই মনে মনে একটা মূর্তি কল্পনা করে নিতে হয়েছে।

সু্র এই একটা বড়ো দুঃখ। সান বিদায় নেওয়ার পর ওর ছোট্ট বাক্সে তার একটা ফটো লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে যখন ওকে গ্রেপ্তাব কবে নিয়ে জেলার সদরে নিয়ে গেল তখন ওরা ফটোটা দেখতে পেয়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে দিল। সেই বছরই থুয়া পৃথিবীতে এলো। বোনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সু আড়চোখে একবার থুয়ার দিকে তাকালো। কোয়েনেব দিকে তাকাতে কোয়েনও সেই দৃশ্য দেখে হাসি চাপবার জন্য মুখে হাত চাপা দিল। থুয়ার ফটো সনাক্তকরণের কায়দা দেখে হাসি চাপা গেল না। মাসির হাসির আওয়াজ শুনে থুয়া চমকে উঠে লজ্জায় রাঙা হয়ে তাড়াতাড়ি বুকের ভেতর আয়না আর ছবিটা লুকানোর চেষ্টা করে।

সু হাসে নি, সে প্রশ্ন করে, কি খুকু? তোমাকে কি বাপির মত দেখতে?

থুয়া জবাব না দিয়ে মুখ ফেরায়। তার চোখে জল ভরে এসেছে। সু বুঝল যা অভিমানী মেয়ে, এখনই কেঁদে ফেলবে। মা একদিন তো সুকে বলেছিলেন, তোর এই মেয়েটা একেবারে তোর মত। বাচ্চা বেলায় তুই ঠিক ওর মতই ছিলি!

মেয়েকে প্রশ্ন করার সময় নিজের চোখও যে কেন জ্বালা করছে তা বোঝে না সু! সে মেয়েকে কোলে চেপে ধরে, আর প্রায় একই সঙ্গে দুজনে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

এই দৃশ্য দেখে কোয়েন নীরবে হাসে। সে বোঝে এই কান্নার পিছনে আছে আজকের আনন্দ আর এতদিনের দুঃখ যন্ত্রণা তিক্ততা ও প্রতীক্ষার বেদনা। বোনের অন্তরের এই আনন্দ-তরঙ্গ নষ্ট করতে চায় না কোয়েন। এ আনন্দ সমগ্র পরিবারের। সে সহসা উঠে পড়ে বলে ওঠে, ঠিক এই তো আমরা চাই। ওর কাছ থেকে যতদিন খবর পাচ্ছিলে না ততদিন কেবল ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছ, আব এখন খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পডছ। এতে কে কি বুঝবে বল?—তারপর যাওয়াব উদ্যোগ কবে বলে—বেশ তো এইখানে বসে বসে কাঁদ প্রাণভবে, আমি যাই মাকে খুঁজে দেখি। মাকে তো খবর দিতে হবে।

ফুঁপিযে কাঁদতে কাঁদতেই সু বলে,—মার জানা হয়ে গেছে। মা সমুদ্রের ধারে গেছে কিছু গলদা চিংড়ি আব অন্য মাছ ধরতে, বাতে খাওয়া-দাওয়া হবে।

কোয়েনের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল, সে থেমে বলল, ও, তাই বল।

চিঠি প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে মহাভোজের আয়োজন। আমাব মনে হয ও বাড়ি ফিরে এলে মা নিশ্চয়ই একটা শুয়োর কাটবে, তার কমে তো নয়ই।

—ঠিক এই জন্যে নয়। তাম চেন আর নাগান আজ সন্ধ্যায় আসছে যে, সেই জন্যে মা গেছে।

—হ্যাঁ, তাই তো বটে! ডিস্ট্রিক্ট পার্টি কমিটির সংবধিত

অধিবেশন আজ সকালে শেষ হয়েছে, তাম চেন আর নাগান আসবে সন্ধ্যা বেলায়। নাগানের 'ভিটি (৩)' বাহিনীর* কিছু কমরেড বলছিল তাম চেন তু নম্বর পল্লীতে ঘাঁটি করেছে কিছু দিনের মত।

সু-ব কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হয়ে এল। সে বলল, তাহলে, মনে হয় উনি বোধ হয় ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছেন। তোর কি মনে হয়?

—নিশ্চয়ই। সেক্রেটারি, তা ছাড়া আন্দোলন ও প্রচার ব্যবস্থার ভাবপ্রাপ্ত...আমার মনে হয় ওর এটা সত্যি পাওনা। মনে পড়ে, সেই সব ভয়ঙ্কর দিনে শত্রু যখন হানা দিত, তখন পার্টি থেকে ওকেই পাঠাতো। ভীষণ বিপদের মুখে ও সব সময়েই কেমন ঠাণ্ডা শান্তশিষ্ট হয়ে থাকত।

—এ কথা ঠিক। সেই সময় ওকে যতবার দেখেছি, আমার সাহস যেন বেড়ে গেছে। সে কথা ভাবলেও কেমন অসাধারণ মনে হয়; বিপ্লবের মুখে অনেক কিষাণ আশ্চর্য বুদ্ধি এবং সাহস দেখিয়েছে।

তাম চেনই একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। মা মণি বলেন যে, ফরাসীদের আমলে ও থাকত ভিন হান-এ এবং প্রতি বছর ফসল তোলার সময় সবাই দেখত যে শর কাঠিব মাদুর গুটিয়ে কাঁধে নিয়ে ও কাজে আসত।

ফেবার সময়টিতেও মনে হত ও যেন একটি যোদ্ধা—

—হ্যাঁ, আবও অনেক আগে থেকেই। আর ওর মনটা একেবারে সোনার। আমাকে যখন জেলে রেখেছিল, ও তখন আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখত, অনেক চিঠি, সেই সব চিঠিতে থাকত সান্ত্বনা আর সাহসের কথা।

...আমি তো সে সব তোমাকে দেখিয়েছি, কেমন দেখাই নি?

* ভো ট্রাং তুয়েন ট্রুয়েন: সশস্ত্র প্রচার বাহিনী।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি তো সব চিঠিই পড়েছি।

সু দুষ্টুমিভরা দৃষ্টিতে তাকাল বোনটির দিকে, তারপর বলল—তাম চেন না থাকলে নাগানের সঙ্গে তোর কবে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত। ও যদি সব বুঝিয়ে না বলত তুই এখনও হয়তো কাঁদতিস।

কোয়েন সন্তুষ্টির হাসি হাসে। খুব অসহনীয় মুহূর্তেও কোয়েনের মুখে এই হাসিটুকু লেগে থাকে। সবাই ভাবে এই হাসি ওর মুখে শেষ পর্যন্ত থাকবে। ১৯৫৮-র সেই একটি মাস ছাড়া ও আর কখনও কাঁদে নি। সেই মাসটি কাটতেই ওর সব দুঃখ যেন ধুয়ে মুছে গেল, কোনও চিহ্ন আর রইল না।

সু তাকে ক্ষেপাতে এই কাহিনী মনে পড়ল: নাগান বয়সে তরুণ, ছাপাখানায় কাজ করত। একটি গুপ্ত সংগঠনের সে ছিল যোগাযোগরক্ষী। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ওকে গ্রেপ্তার করে ফুলোই শহরে এক বন্দী শিবিরে পাঠানো হল। দিয়েম আর মার্কিনরা বন্দীদের ওপর বিষ প্রয়োগ করায় যে লড়াই হয় তাতে নাগান অংশ গ্রহণ করেছিল। শত্রুপক্ষ যখন ওদের কয়েকজনকে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিতে যাচ্ছিল তখন যারা ট্রাক থেকে লাফিয়ে পালিয়েছিল সেই দল থেকে, ও তাদের অন্যতম। কিষাণরা ওদের হাতের হাতকড়া কেটে দিয়ে লুকিয়ে রাখে এবং পরে পালাতে সাহায্য করে। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে যখন ও হোন দাৎ-এ এল তখন ওর বয়স বাইশ বছর, কিন্তু তখনই ও তিন বছরের পার্টি মেম্বার। কারাগারে থাকার সময় তাকে সদস্য করা হয়। কোয়েনকে নাগান পরে বলেছিল যেদিন ও সদস্য দলে আসে সেদিন ওর শৃঙ্খলিত দুটি হাত তুলে কল্পনানেত্রে পতাকাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

হোন দাৎ গ্রামে এসে ওর কাজ হল তরুণ তরুণীদের নিয়ে সংগঠন করা। এই সময়টিতে কোয়েনের সঙ্গে দেখা হয়। কোয়েনের বয়স তখন মাত্র সতের। সে সময়কার আরও অনেক গ্রামের মত হোন দাৎ তখন দিয়েমের দালালদের কুক্ষিগত। একবার প্রায় দু মাস

ধরে কোয়েনদের বাড়ির কাঠের মেঝের তলায় গহ্বর খুঁড়তে হয়েছে। বিপ্লবের পথে কোয়েনের সেই হাতেখড়ি।

কোয়েন সবেমাত্র একা একা কাজ করতে সুরু করেছে এমন সময় জানা গেল যে শত্রুপক্ষ ওর সন্ধান জেনে গেছে। তখন নাগানকে সরে পড়তে হল। নাগান আশ্রয় নিল কতকগুলি আসল সমাধির পাশাপাশি গড়া একটা নকল সমাধিস্তূপে। প্রতি রাতে কোয়েন সেই সমাধিতে ওর জন্য খাবাব নিয়ে যেত এবং তার সঙ্গে বিপ্লবের কাজকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করত। মাঝে মাঝে খাবারের সঙ্গে কলা আম প্রভৃতি থাকত। ময়লা কাপড় ছাড়িয়ে পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে, গোপনে ময়লা কাপড় বাড়ি নিয়ে আসত পরিষ্কার করার জন্য। কোন কারণে আসার প্রতিবন্ধক ঘটলে সাউ-এর মা ওর জায়গায় কাজ চালাতেন। কিন্তু বৃদ্ধা যতবারই এই গুপ্ত আড্ডায় আসতেন ততবারই কান্নায় ভেঙে পড়তেন।

একবার তিনি নাগানকে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন-- আমরা কি সারাজীবন ধরে এমনভাবে মাথা নত করে চলব? ওরা আমাদের লোকজনের পেটের নাড়িভুঁড়ি বার করে চলেছে, মাথা ভেঙে চুরমার করছে। গতকাল জলার মধ্যে আমার মেয়েরা কিছু হাড় মাংস এই সব পেয়েছে। আমাদেব সাতজনকে ওরা পিটিয়ে মেরেছে সেদিন, এ তাদেরই দেহের অংশ।

এই বলে সাউ চাপা কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

নাগান প্রশ্ন করে, ঐ সব দেহাংশ কোথায় রাখা হল?

মা বললেন, ওরা একটা নাইলনের কাপড় জড়িয়ে একটি গুহার ভিতর লুকিয়ে রেখেছে।

আর একবার মা নাগানের হাতটি নিজের হাতেব মুঠোয় ধরে দীর্ঘ ইতঃস্তত ভঙ্গি কাটিয়ে কোমল গলায় বললেন, নাগান তোমাকে আমার নিজের ছেলের মতই ভাবি। আমাকে খুলে বল তোমার সঙ্গে কোয়েনের কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে? তুমি যদি তাকে

ভালোবাসো তাহলে বলো সে কথা, আমি তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।

তরুণ নাগানের চোখে জল এল, জননী সাউকে সে জড়িয়ে ধরল। প্রকৃতই, কোয়েন আর নাগান দুজনে গভীর ভালোবাসায় আচ্ছন্ন। কিন্তু নাগান খুশি হল এই ভেবে যে, যখন শত্রুপক্ষ এসে চারিদিক থেকে হানা দিচ্ছে, যখন তাকে এই অদ্ভুত এবং বেয়াড়া গুপ্ত স্থানে আত্মগোপন করে থাকতে হচ্ছে, তখন মা মনের কথা খুলে বললেন। তার এই ভালবাসাটুকু ছাড়া বিপ্লবের প্রতি জননী সাউ-এর কি অবিচল নিষ্ঠা তাও আজ জানা গেল। গুপ্ত আবাসের অন্ধকারে বসে নাগান এই সব ভাবে। কেন মার মনে এল না যে, আগামী কালই ওরা নাগানকে হত্যা করতে পারে। কোয়েন এখন পূর্ণ যুবতী। তাব উপযুক্ত পাত্রের অভাব হবে না। কারণ সে সুন্দরী, অনেক তাঁবেদার অফিসার আছেন, তাঁরা ওর সঙ্গে মধুব ব্যবহার করেন। এছাড়া শহব থেকে কত যুবক আসে হোন ট্রের সাগর উপকূলে সাঁতার কাটতে। অনেকবার জননী সাউ প্রতিবেশীদের কাছে বলেছেন, আমার মেয়ে এই সব ছেলেদের উপযুক্ত নয়।

এই সব প্রার্থীদের অতিরিক্ত আগ্রহ কোয়েনকে বিরক্ত করেছে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে রোজ যখন এই গোপস্থানে এসে হাজির হয় তখন তার মন থেকে ধুয়ে মুছে যায় সব গ্লানি। তাব মনে জাগে কোমল মধুর ভাব, আশা ও আনন্দের প্রবাহ। বাল্যকাল থেকে এই জায়গাটিতে আসতে সে ভয় পেত, এমন কি দিনের বেলাতেও নয়। এখন আর কিন্তু এতটুকু ভয়-ডর নেই। এখন আর ভূতের ভয়ে সচেতন থাকতে হয় না, ভয় করতে হয় পুলিসকে। সৌভাগ্য এই যে, ঐসব তাঁবেদাররা গোরস্থানের ওপর এতটুকু নজর রাখেনি। এই গোপন আশ্রয়ে নাগান দুটি মাস নিরাপদে কাটিয়ে তারপর অরণ্যের অভ্যন্তরে গোপন ঘাঁটিতে চলে গেছে।

একদিন অদৃষ্টেব ফেরে দুপুরবেলায় ও যখন ঘাঁটিতে ফিরছিল

তখন গ্রামের প্রান্তে নাগানকে ওরা ধরে ফেলল। সেই রাত্রেই জঙ্গলের ঘাঁটিতে শত্রুদল এসে অবরোধ করল। ভাগ্যক্রমে ঘাঁটির সবাই সে সময় অন্যত্র ছিল। তাঁবেদার বাহিনী এসে দেখল সব শূন্য, ফাঁকা। ওরা নাকি চীৎকার করে বলছিল, কি জ্বালা! লোকটা তো বলেছিল এইখানেই ঘাঁটি।

—এখানেই ঠিক, তবে কি জানো আমরা আসছি দেখে পালিয়েছে।

ওরা সবাই আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে চলে গেল। এই ঘটনার পর ঘাঁটির একজন বলল, নিশ্চয়ই নাগান আমাদের সন্ধান দিয়েছে।

—ও ছাড়া আর কে?

-বোঝা দায়। লোকটাকে আমরা বিশ্বাস করতাম। নাগান ধরা পড়তে আমরা তাই ঘাঁটি ছেড়ে যাইনি, আর ও কিনা সব বলে দিল?

কোয়েন শুনল নাগান ধরা পড়ার কথা, আর প্রায় সেই সঙ্গেই জানালো তার বিশ্বাসঘাতকতার কথা। এ ভয়ংকর খবর। একই দিনে তুটি হতবুদ্ধিকর বজ্রাঘাত মাথায় পড়ল। এ কল্পনাতীত। নাগান এমন একটা ঘৃণ্য অপরাধ করবে, এ যে বিশ্বাসের বাইরে। ওর মা বা বোন সু কেউই একথা বিশ্বাস করলো না। কিন্তু গুজব চকিতে সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। কোয়েনের বাগদত্ত প্রেমিক ঘাঁটির সন্ধান দিয়েছে। ভালো লোক যাঁরা, তাঁরা অবশ্য সহানুভূতির দৃষ্টিতে কোয়েনকে দেখতে লাগলেন। কিন্তু কোয়েন নিজে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। কে যেন সহসা ওর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করেছে মুগুর দিয়ে। সারা রাত ধরে ও কাঁদল। মনে হল তুজনের মধ্যে সকল সম্পর্কের এই অবসান, ওদের মিলন-খেলা ভাঙলো এবার। কিন্তু তখনি আবার তার ভালোবাসার পাত্রটির দৃঢ় চরিত্রের কথা মনে পড়ায় ও চেঁচিয়ে উঠল—না, না, এ কখনই সত্য নয়।

গুজবের শক্তিতে শঙ্কিত হয়ে নাগানের ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য ও প্রাণপণে চেষ্টা করে বিশ্বাস করতে চায় না সব কথা। মানসিক দ্বন্দ্বে ক্লান্ত হয়ে ও একদিন গেল পার্টি সেক্রেটারি হ্বাই থেপের সঙ্গে দেখা করতে। তার কথা মন দিয়ে শুনে তিনি বললেন—শান্ত হও। কমিটি সমস্ত ব্যাপারটি অনুসন্ধান করছেন। এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। স্পষ্ট প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়নি। আমরা তাম চেনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। সে সুপারিশ করছে—তাড়াতাড়ি নেই। যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তা কমরেডকে বিশ্বাসঘাতক প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অনুসন্ধান নিশ্চয়ই প্রয়োজন। তবে শত্রুর কৌশলটাও মনে রাখা দরকাব। আমি একটা তদন্ত শুরু করেছি। তোমাকে সব জানাবো।

সামান্য ভরসা সঞ্চয় করে কোয়েন বাড়ি ফেরে। বাড়ি এসে বোনকে বলল, কিছুই স্থির হয়নি। পার্টি এখনও কিছু স্থির করতে পারেনি।

আমি তোকে ত বলেছিলাম একথা। পার্টির সদস্যরা অনুসন্ধান কবাব বিষয় একটা নোট পেয়েছেন। বাচ্চার মত দিনরাত কাঁদিস নি অমন কবে - একটু ধৈর্য ধর।

- বেশ, তুই বা পার্টি যা বলছে সেই কথাই শুনব, আব ভেঙে পড়ব না।

সু একটু ইতস্তত করে বলে, বেশ, - কিন্তু শোন—নাগান যদি কিছু না বলে থাকে, সব দিক থেকেই ভালো কিন্তু যদি বলে থাকে, কি করবি তুই…?

কোয়েন চুপ করে থাকে। তারপর, ভাঙা গলায় বলে, কিছুই করার থাকবে না আব। মনে করব ও মারা গেছে, নাগান বলে কেউ কোনোদিন ছিল না।

যাই হোক প্রায় দেড় সপ্তাহ পরে তাম চেন জেলা থেকে ফিরে এলো ঘাঁটিতে। এসেই তলব করল কোয়েনকে। কোয়েনকে দেখেই

তার প্রথম কথা, আগে একটা মুরগী আমার জন্য মারো, তারপর কিছু দামী কথা শোনাবো।

কোয়েন তৎক্ষণাৎ বুঝে নেয়। তার বুক ঢুপ ঢুপ করছে। সে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর হাত দুটি চেপে ধরে। তাম চেন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তার পর রাগ করে বলে, কি তাহলে একটা মুরগী হবে ত ?

সলজ্জ ভঙ্গিতে কোয়েন বলে, হাঁ, হাঁ—তাই হবে।

তাম চেন ওকে কেবিনের এক প্রান্তে নিয়ে যায়, সকলের নজরের বাইরে, তারপর মৃদু গলায় বলে—শুনেছি, তুমি কদিন খুবই ভেঙে পড়েছ। সত্যি ? যাক্‌গে তোমার দুঃখ করার কিছু নেই। নাগান বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি।

.তাম চেন থামল। সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে নিয়ে আবার বলে, আমরা একটা টিকটিকির আড্ডার সন্ধান পেয়েছি। সব গোয়েন্দার দল সেখানে থাকে। অন্য সব কথার সঙ্গে গেলমাসের ঘটনা নিয়ে ওরা আলোচনা করছিল। আমাদের ঘাঁটিতে আক্রমণের কারণ, ওদের একজন এজেণ্ট একটা উঁচু গাছের ওপর চড়ে সকলকার আসা-যাওয়া লক্ষ্য করছিল। একদিন সে দেখল, গাছের ভিতর থেকে ধোঁয়া উঠছে। এই খবর ওদের সর্দার একসামকে জানায়। শেষ পর্যন্ত ধোঁয়া থেকেই এই বিপদের সৃষ্টি—আর কিছু নয়।

কোয়েনের বুক থেকে একটা মস্ত ভারী পাথর সরে গেল. সঙ্গে সঙ্গে একটা জোর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল।

তাম চেন বলে চলে, অন্যদিকে কারাগার থেকে আমাদের সংবাদ সূত্রে জানা গেল নাগান একবারও ভেঙে পড়েনি। শত্রুপক্ষ ওর ওপর বারবার যথেষ্ট অত্যাচার করা সত্ত্বেও একটু কিছু আদায় করতে পারেনি।

কোয়েন উঠে দাঁড়ায়, তার মাথা ঘুরছে। আত্মগ্লানি ও আনন্দে তার মন ভরে উঠেছে। তার মনে হল সে যেন এক কৃপণ, দস্যু

তার সর্বস্ব অপহরণ করেছিল, তারপর সে সমস্ত সম্পদ ফিরে পেয়েছে, আর দেখছে তার সেই সম্পদ অনেকগুণ বেড়ে গেছে। নাগান সম্পর্কে এক প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভালোবাসায় ওর মন ভরে যায়। মন থেকে সব তিক্ততা, সব ঘৃণা ধুয়ে-মুছে গেছে। নাগান সম্পর্কে ওর যা ধারণা, এখন দেখা যাচ্ছে সে তার চেয়েও অনেক বেশী। নাগানকে না হারিয়ে আরো বেশী করে পেয়েছে সে। আহ্লাদে আটখানা হয়ে সে তাম চেনের হাত ধরে এমনই নাড়া দেয় যে হাত প্রায় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। যা সে কলঙ্ক মনে করেছিল, এখন দেখছে তা নিয়ে গর্ব করা যায়।

সবচেয়ে অবাক কাণ্ড এই যে তাম চেনের এই সংবাদের পাঁচ দিনের ভেতর এক বৃষ্টিঝরা রাতে স্বয়ং নাগান এসে উপস্থিত। কেউ অবশ্য তাকে প্রত্যাশা করে নি। কোয়েন মার সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে। দরজায় এক ধাক্কা পড়ল, কে যেন ডাকছে। একি স্বপ্ন! প্রথমটা তাই মনে হয়েছিল। তারপর বোঝা গেল স্পষ্ট, নাগানের কণ্ঠস্বর—মা, কোয়েন, দরজা খোলো।

দরজা অর্ধেক খুলতে না খুলতেই নাগানের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। তার আপাদমস্তক ভিজে।

তরুণ চাপা গলায় বলল—কোয়েন!

ও নাগান!

আমি এই মাত্র পালিয়েছি। আমাকে নদীর ধারে নিয়ে যাচ্ছিল হত্যা করার জন্য। আমি ওদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছি—তারপর এই এখানে—

কোয়েন প্রিয়তমের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, হা ভগবান!

কিন্তু নাগান ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, আমাকে এখনই ঘাঁটিতে নিয়ে চলো। ওরা আমার সন্ধান করবে। যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়বে।

দ্বিতীয়বার চিন্তা করে কোয়েন্ জোর গলায় বলে, তুমি এখানেই থাকো।

পলাতক নাগান উদ্বেগভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করে, সে কি করে হবে?

—পুরানো লুকোনোর জায়গায় বেশ নিরাপদেই থাকবে, মাটির তলায় সেই জায়গাটা এখনও আছে। তা ছাড়া, ঘাঁটি আবার ওখান থেকে সরে গেছে। তারপর ওকে বেশ করে জড়িয়ে ধরে বলে, চলে এসো।

নাগান মেনে নেয়। এই মেয়েটার উপস্থিতি ওর অন্তরে সাহস এনে দেয়। রাতে কোনো শত্রু সেনা আসেনি। কিন্তু সতর্কতার প্রয়োজনে তার পরদিন সন্ধ্যার আগে কোয়েন নাগানের সঙ্গে আর দেখা করল না। কোয়েন ওর গ্রেপ্তার আর নির্যাতনের কথা শুনতে চায়। তারপর পিঠে মলম লাগানোর জন্য জামাটা খুলে ফেলে। কোয়েনের মা এই মলম তৈরী করেছেন।

জামা খুলতেই কি বীভৎস দৃশ্য। পিঠের চারদিকে আঘাতের চিহ্ন। এই গুপ্তগহ্বরের ঠিক উপরেই মা চিকেন-স্যুপ বানাচ্ছেন স্য-কে সঙ্গে নিয়ে। নাগানের জন্য এই আয়োজন। নাগান এখনও যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। তবু যথাসাধ্য সচেতন হয়ে কোয়েনকে বলে, আমার গ্রেপ্তারের পর কি কি ঘটেছে বল।

কোয়েন ভাবে যে গুজবের কথাটা কি বলবে। তারপর সব কথাই খুলে বলে যায়।

সব শুনে নাগান বিড়বিড় করে বলে, তাহলে এত সব কাণ্ড ঘটে গেছে।—তারপর সহসা উঠে বসে বলে, তুমিও নিশ্চয়ই আমাকে ঘৃণা করেছ?

কোনো উত্তর শোনার আগেই নাগান আবার শুয়ে পড়ে। তারপর সে গুপ্ত কক্ষের প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে বলে, জানো, নাগান যদি এই কাজ করত তাহলে তাকে তুমি নিজের হাত দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে পারতে, আর সেই হত উচিত

শাস্তি। তবে এ সব ঘটে নি। দাঁতে দাঁত দিয়ে সব নির্যাতন সয়েছি। বলেছি—আমি কিছুই জানি না, যদি কিছু জানতাম তাহলেও তোমাদের বলতাম না।

সহসা নাগানের মৃত্থ গলা তিরস্কারে কঠিন হয়ে ওঠে, অপরে যা খুশি মনে করুক, তুমি কি করে বিশ্বাস করলে এইসব? কি করে সন্দেহ করলে আমার সম্বন্ধে?

কোয়েন বোঝে। সে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। নাগান কখনও তাকে এ ভাবে ধমকায় নি। অনেকক্ষণ পরে সে বলে, আমি কিন্তু কখনই এই সব বিশ্বাস করিনি।

—সবটা নয়, একটুও তো বিশ্বাস করেছিলে। ও একই কথা!

ঠিক এই সময়ে ওপরের দরজায় ঘা পড়ে। সু এসেছে চিকেন সুপ নিয়ে। সে লক্ষ্য করে বোনটির চোখে জল ঝরছে।

দুই

তাম চেন পথ চলতে থমকে দাঁড়াল, গ্রাম প্রান্তর চোখ ভরে দেখছে। তারপর সপ্রশংস কণ্ঠে বলল, যতবার আমি এই হোন দাং এ আসি ততবারই যেন একে নতুন বলে মনে হয়। কি সবুজ, কি অপূর্ব ঐ আপেল গাছের পাতা—কেমন তাজা, কেমন অদ্ভুত!

নাগান আর দাং, ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারির আর্মড গার্ড সঙ্গে ছিল, তারাও থমকে দাঁড়ায়। নাগান হোন দাং-এর সৌন্দর্য চোখ ভরে দেখে।

হোন দাং পর্বত তার আর দুই সহোদরের চেয়ে আকারে বড়, হোন-মি আর হোন সোক পাহাড় দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট। তাদের পায়ের তলায় পড়ে আছে ক্ষুদ্র গ্রাম, সবুজ মাঠ যেন হাসছে। এই হল দ্বাদশ চান্দ্রমাস, বসন্ত উৎসব আর নববর্ষ আসন্ন—টেট পরবের

উপযুক্ত হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সূর্যালোকিত গ্রামাঞ্চলে সেই হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে।

নাগানের কাঁধে হাত রেখে তাম চেন আবার পথচলা শুরু করে। বলে, সত্যি, জায়গাটা অপূর্ব। অথচ বিদ্রোহের পর এক বছরও কাটেনি, এর ভিতরই সব কিছু পরিবর্তিত। এখানকার মানুষের দৃঢ় প্রতিরোধকে ধন্যবাদ, বছরের মাঝামাঝি শত্রুদল যখন খতম করা শুরু করেছিল শুধু ওদের জন্যই তারা সফল হয়নি।

—আচ্ছা, সত্যি কি ওরা আমাদের অঞ্চলে রাসায়নিক বিষ ছিটিয়ে দিয়েছিল ?

– হাঁ। তবে, তার ফলে ওদের পরাজয় দ্রুততর হয়েছে।

এই হোন দাং এ ওরা সত্যিকার মার খেয়েছে।

—তবু ওরা আরো অনেকবার ফিরে আসবে। ওরা জানে এইখানে আমাদের একটা ঘাঁটি আছে। শহরের দিকের সব অভিযান এইখান থেকেই শুরু হয়। তার ওপর হোন দাং আবার সিয়াটোর আওতায় পড়ে। আমরা ওদের এখানে চাই না। যদি কোনো ঘাঁটি বানায়, আমরা উড়িয়ে দেব। তাম চেন ওর গতি কিঞ্চিৎ শ্লথ করে মৃদু হেসে বলে, নাগান তোমার কাছে হোন দাং-এর একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। যেখানেই যাও না কেন, এখানে তোমাকে আসতেই হবে, এখানে তোমার শিকড় নামিয়েছ যে— এই রসিকতায় নাগান একটু হাসে। ওর সঙ্গী প্রশ্ন করে—বেশ, তাহলে বিয়ের ভোজটা কি টেট পরবের পর হবে নাকি ? বরং নববর্ষ উৎসবের মধ্যেই সেরে ফেলা ভালো। তাহলে আমি এই বিয়েতে মাতব্বরি করার সুযোগ পাবো, বরকর্তা সাজব। কারণ টেট পরব শেষ হলে একটা পাঠচক্র শুরু হবে। জানো হে, আমাদের পূর্বপুরুষরা বলতেন—যখন স্থির করবে বিয়ে করবেই, তখন আর ঘুরে বেড়িয়ো না। যত্রতত্র— এ সব কথা একেবারে দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকথা। জান তো বিপ্লব আর বিবাহ—দুটি পরস্পর বিরোধী কর্ম মনে হয়—

তোমার কাছে ও দুটিই এক বস্তু। বিয়ে অনেক সময় মানুষকে অলস করে দেয় সন্দেহ নেই, কিন্তু অনেকের আবার কর্মে দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়ে। এ সব স্বামী-স্ত্রীর ওপর নির্ভর করে। তোমার সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। আর কোয়েন— ভালো পাত্রী। যুব ফেডারেশনের জন্য সে যেমন পরিশ্রম করে, গৃহস্থালী কাজেও ঠিক তেমন খাটে। রান্না করে, বাগান দেখে, সেলাই করে। ভালোই জুটেছে। গেল বছর তোমাদের একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। তবে কি জানো, স্ত্রীলোকের চরিত্রটাই ঐরকম। তোমার বরং খুশী হওয়া উচিত। ও যদি অন্যরকম হত, গুজবের কোনো প্রতিক্রিয়া না জাগত ওর মনে, তাহলে তোমাকেই চিন্তা করতে হত। সত্যি কথা বলতে কি, ও একেবারে পাগলের মত হয়ে গিছল।

নাগান হাসল। মনের খুশি চাপা দেওয়াব চেষ্টা করল। এখন সে বোঝে, বেচারী কোয়েন কি মানসিক ক্লেশেই না কাল কাটিয়েছে।

গ্রামের কাছে পৌঁছে তাম চেন প্রশ্ন করে, কই নাগান, তোমায় লোকজন সব কোথায়?

—গ্রামের একেবারে মাঝখানে। আপনি কি আমাদের দেখতে যাবেন?

—হাঁ, আমি হাই থেপের সঙ্গে দেখা করব। তারপর সঙ্গের লোকটির দিকে ফিরে বলে, তুমি একবার তোমাদের গ্রাম লিন কোয়েনায় ঘুরে আসবে নাকি দাং?

লোকটির মুখ রাঙা হয়ে ওঠে, মাথা নাড়ে।

—বেশ যাও। কাল ফিরে আসার চেষ্টা কোরো।

তরুণ গার্ড যুবকটি দাঁত মেলে বন্দুকটা ঠিক করে নিয়ে বলল, বিদায়।

তারপর অতি দ্রুতগতিতে বাড়ির পথে পাড়ি দিল। এখান থেকে ওর বাড়ি তিন-চার মাইলের ভেতর।

হোন দাং পাহাড়ের ঠিক নিচেই হোন দাং গ্রাম। লোকে বলে, ফসল কাটার সময় এই জেলার প্রধান শহর থেকে এই তিনটি পাহাড়ি অঞ্চলকে দেখে মনে হয়, যেন একটি তরুণী সোনালি মাদুরে গা এলিয়ে পড়ে আছে, সবে তার ঘুম ভেঙেছে, পা ছড়াচ্ছে—মাথায় একটি নীল রঙের রিবন বাঁধা। হলুদ রঙের ধানের ক্ষেত হল সোনালি মাদুর। আর নীল রিবন কি নদীর জল?

গ্রামের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে দুজনের কানে গেল একটি সমবেত সঙ্গীতের সুরঝঙ্কার—সেই সঙ্গে নারীকণ্ঠ।

নাগান চেঁচিয়ে বলে, এ আমাদের গাইয়ে নাম নো।

তাম চেন বলল, বেশ, এখানকার সেনারা বেশ মজায় আছে, একঘেয়েমি নেই কিন্তু গলার আওয়াজটা বেশ মিঠে, সত্যি কি নাম নো? বেশ সাধা গলা। সেনারা সবাই নিশ্চয়ই ভালোবেসে ফেলেছে এই কণ্ঠস্বরকে। আচ্ছা সত্যি কি কা তুঙ-এ সেনারা এই মেয়ের গান শোনার জন্য গুলি ছুঁড়তে আপত্তি করেছিল?

—কথাটা সত্যি, কয়েকজন সেনা বলেছিল, ওগো শ্রীমতী তুমি আবার গান করো, আমরা মিনতি করছি গান করো। আমরা তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি, আমরা গুলি করবো না।

—তা একরকম ভালোই। তবে ওর গানের কথাগুলি কি? এই প্রশ্নটাই কঠিন, আমি নিজেই জানি না। তবে কি জানো গান এমন হবে যে তা শুধু হৃদয়ে বাজবে তা নয়, যুক্তিতেও। ঐ সব তাঁবেদার সেনাদের পেশাদারি সেনাগিরিতে অরুচি ধরিয়ে দেবে, ঘরে যে স্ত্রী পুত্রকন্যা আছে তাদের কথা মনে পড়বে, সেনাদল ত্যাগ করাব মত মনোবল গড়ে উঠবে। শুকনো তাত্ত্বিক কথা নয়, আবার ললিত লবঙ্গলতাও নয়,—ওরা যদি নাম নোকে শ্রীমতী বলে ডেকে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে নাম নোর গান রীতিমত ভাবাবেগে ভরা—তাই নয় কি?

—না, যেমনটি ভাবছেন তা হয়তো নয়। আপনি তো জানেন

সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলে পেশাদার সৈনিকের কি অবস্থা হয়। নাম নো ওদের কুৎসিত ইতরামিকে সর্বদাই থাবড়ানি দেয়। ও বলে নেহাৎ এটা আমার বৈপ্লবিক কর্তব্য তাই, নইলে, বেটাদের প্রলয়ের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

—আচ্ছা, রাচ গিয়া থেকে যে ছোট্ট ছেলেটি এসেছিল তাব নাম বুঝি দিয়েপ, তার খবর কি?

—ছেলেটা ভালো। ইউনিটের সবাই ওকে ভালোবাসে। তবে স্বভাবতই আমাদের জীবনধারা ওকে একটু আধটু বেসামাল করে দেয় মাঝে মাঝে।

শহরের ছেলেরা সবাই গোড়ার দিকে অমন থাকে। ওদের দিকে বিশেষ একটু নজর রাখা প্রয়োজন। এ ছাড়া এটা আমাদের কর্তব্যও বটে। ও আমাদেরই এক কমরেডের ছেলে, তিনি একটা বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন।

প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গীতের সুর স্পষ্টতর হয়ে আসে। তাম চেন তু দোনের একতারার আওয়াজ চিনতে পারে। সে বলে ওঠে—বুড়ো অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ওর বাজনাটা যেন আরো মধুর হয়ে উঠেছে।

রাস্তার শেষ প্রান্তে শতাব্দীকালের পুরাতন তেঁতুলগাছটা তু দোনের বাড়ির ওপর ছড়িয়ে আছে। তু দোনের বাড়িটা যেন পথের পাশের খাবারের দোকান। একটা বিরাট হলদে কুকুর ছুটে এসে ওদের দুজনকে ঘিরে আনন্দভরে ডাকতে থাকে, ওদের পা চাটার উপক্রম করে। ঘরের ভিতর যখন পৌঁছালো তখন শোনা গেল, "তোমরা উঠে দাঁড়াও"—গানটির প্রায় শেষ কলিতে পোঁছেছে। এ গান অতি পরিচিত প্রাচীন সুরের গান। সশস্ত্র প্রচার বিভাগের কর্মীরা বাদক এবং গায়ককে ঘিরে আছে। ওরা দুজনে ঘরে ঢুকতেই সবাই চেঁচিয়ে ওঠে—তাম চেন আর নাগান।

তাম চেন সবাইকে আলিঙ্গন করে, করমর্দন করে একটি বালককে জড়িয়ে ধরে বলে—কি খবর, কেমন লাগছে রিয়েপ ?

ছেলেটির চেহারা দেখেই বোঝা যায় সে স্কুলের ছাত্র। দিয়েপ তরুণীর মতো সলজ্জ ভঙ্গীতে মুখ রাঙা করে বলে—ভালো আছি কাকাবাবু !

এর পর তাম চেন কিন্নরকণ্ঠী নাম নোর করমর্দন করে বলে, নমস্কার, এ আমাদের শ্রেষ্ঠতম গায়িকা।

মেয়েটি প্রতিবাদ করে বলে, খুব হয়েছে দাদা, আর বলবেন না।

অন্ধ বৃদ্ধ বাদকের কাছে গিয়ে তাম চেন বলে, কি তু খুড়ো কেমন আছো ?

তু দোন ওর পিঠ চাপড়ে বলে—ও তাম চেন !

তারপর নীরবে হাতটিতে মোচড় দেয়। একটু পরে বলে-- এবার অনেকদিন পরে এলে ? না আগেও এসেছ আমার সঙ্গে দেখা করোনি ?

বৃদ্ধের জরাজীর্ণ কাঁধে আস্তে হাতটা রেখে তাম চেন বলে, খুড়ো কাজের চাপে সময় পাই না—আমি কিন্তু কখনও হোন দাৎ-এ এসে তোমার সঙ্গে দেখা না করে যাই না।

তাম চেন চারিদিকে তাকিয়ে বলে, টিম কোথায় ?

—সে নদীতে মাছ ধরতে গেছে।

অন্ধ বৃদ্ধ তু দোন নীরবে দৃষ্টিহীন চোখে তাকিয়ে থাকে। যেন কে কোথায় আছে বোঝার চেষ্টা করে। ন বছর আগে যে চোখ দিয়ে সে প্রকৃতি আর মানুষের মুখ দেখেছে, সেই চোখের আলো আজ নির্বাপিত। আর কোনো প্রতিবেশীকে সে দেখতে পারে না—সেই তেঁতুলগাছটাও নয়, পাহাড়ের চূড়ো, সমুদ্রতীর, প্রিয়জন, কোনো কিছুই দেখতে পায় না।

তাম চেনের দিকে তাকিয়ে অন্ধ বৃদ্ধ সহসা বলে, আমি যা বলেছি তা তোমাকে আঘাত করার জন্য বলিনি। যখন সময় পাবে

তখন আমাকে দেখতে এসো—আমি জানি তোমরা সবাই বিপ্লবের কাজে কত ব্যস্ত। আমি তার জন্যই খুশী, আমার কাছে এলে যেমন খুশি হই ঠিক তেমনিই।

একটু পরে তাম চেন বলল, আচ্ছা খুড়ো, তুমি কি এখনও সেই রকম মাল টান ?

উত্তর দেওয়ার আগে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তু দোন বলে, হাঁ, তবে তেমন বেশী নয়।

--যত কম চালাতে পারো ততই ভাল খুড়ো।

—ঠিক বলেছ বাবা, এখন আব আগের দিন নেই। আপনজনদের মাথা মুগুর মেরে চুরমার করছে শত্রুরা. এই অবস্থায় কে চুপ করে ঘুমোতে পারে। কিন্তু আমি অন্ধ, কি আর করব? শুধু চাল বাঁচিয়ে রাখি, কেউ যদি আমার আস্তানায় আসে ওদের হাত থেকে পালিয়ে তখন তাকে খেতে দিই। ওরা চলে যাওয়াব পব চোখ আর বোজাতে পাবি না, তখন একটু আধটু মদ টানি। তারপব একটু থেমে বলে—তবে কি জানো। জনগণের এই অভ্যুত্থানের পর আমি আর তেমন মদ খাই না আজকাল।

তাম চেন বৃদ্ধের হাত আরও জোবে চেপে ধরে। আবার মনে হয় কি যেন একটা প্রবল হয়ে উঠছে মনে, তাব চাঞ্চল্য অসীম।

তিন

বারান্দাব উপর মাছগুলি ছড়িয়ে রেখেছে কোয়েন। মাছেরা তখনও খাবি খাচ্ছে। একটা চওড়া ছুরি দিয়ে বাঁশ ছুলে নিয়ে তাতে মাছগুলি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখে, তাবপর এক একটির আঁশ ছাড়াতে থাকে। বিবাট মাছ হাত দিয়ে আঁটা যায় না—প্রায় চার কিলোগ্রাম ওজন হবে। মা বলছিলেন সমুদ্রতীর থেকে বাড়ি আসবার সময় এ হাত ও হাত করে ঝুলিয়ে এনেছেন।

কোয়েন মাছটা বানাবার পর তৈরীর উদ্যোগ করার সময় বাইরে সিঁড়িতে একটা আনন্দভরা কণ্ঠ শুনতে পেল—মা, ওমা—

এ তাম চেন। তারপরই আরেকটি কণ্ঠ, নাগানের আনন্দময় কোমল কণ্ঠ চিনতে দেরী হয় না কোয়েনের। তাড়াতাড়ি মাছটা মাটিতে রেখে হাতটা ধুয়ে ফেলে, কপালে ঝরে পড়া অলকগুচ্ছ পিছন দিকে সরিয়ে দেয় কোয়েন। অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, ওঃ তাম দাদা বুঝি।

নাগানের দিকে একটা সংক্ষিপ্ত হেসে কোয়েন তাম চেনকে নিয়েই ব্যস্ততার ভাব দেখায়। প্রিয়তম নাগানকে একটা ঢলঢলে কালো কোটে দেখে অতিকষ্টে হাসি চাপে কোয়েন। কোথা থেকে জামাটা ধার করেছে কে জানে। নাগানও তার প্রিয়তমাকে কিছু বলে না।

মাঝের ঘরটিতে বসে থুয়াকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে খুব শব্দ করে চুমা খায়। প্রতিবারই বাচ্চাটা চুমা ফিরিয়ে দিচ্ছে। নাগান বলছে আরও চুমা দাও, আগেরটায় তেমন শব্দ হয়নি। অবশেষে সে বাহুর বাঁধন শিথিল করে ছেড়ে দেয় থুয়াকে তাম চেনের কাছে যাওয়ার জন্য। সে দৌড়ে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে একটু থেমে তাম চেনের গলাটা জড়িয়ে ধরে।

ওরা সস্নেহ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। জননী সাউ যথারীতি পান চিবোতে চিবোতে এই দৃশ্য দেখছেন। পিছনে কোয়েন মার জামায় একটা পিন এঁটে দিচ্ছে। আর সু মুখ টিপে হাসছে। তবে মেয়ের প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করে সে মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করছে।

তাম চেন প্রশ্ন করল, স্কুলে যাও নাকি থুয়া?

পরিষ্কার গলায় থুয়া বলে. হাঁ কাকু।

—একা একা?

—না দিদিমা সঙ্গে যায়—এই বলে দিদিমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার বলে—জানো, দিদিমা রোজ আমার সঙ্গে যায়।

জননী সাউ বিছানায় বসে সব শুনছেন, এখন কসের দু-পাশে পানের ছোপ পুঁছতে পুঁছতে বলেন—রোজ ওকে দিয়ে আসি, নিয়ে আসি। তবে মেয়ের যা বায়না—রোজ বলবে আমি একা যাই না, দিদা, বেশ যেতে পারব। কিন্তু কি করে ছেড়ে দিই—আকাশে দিনরাত প্লেন উড়ছে, ওদিকে সমুদ্রের দিক থেকে যুদ্ধ জাহাজ মাঝে মাঝে শেল ছাড়ছে। তুমিই বলো তাম চেন—

—কেন আমরা ত অনেক শেলটার তৈরী করেছি দিদা ?

দেখছো তাম চেন ? ওর যুক্তি ? শেলটার ত আছেই। কিন্তু বলো ত বাবা, যদি শেলটারের ভেতর সাপ থাকে ত ও কি করবে।

তাম চেন জ্যাকেটটা উঠিয়ে পিস্তলের কোমরবন্ধটা খুলছিল। এই কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ল। সবাই হাসছে। কোয়েন মার কাঁধে মুখ ঠেকিয়ে হাসছে, তারপর বলে মার সব তাতেই ভয় ভয়—।

ছোট মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মা বলে ওঠেন,—হ্যাঁ আমি ভারী ভীতু।

তাম চেন আত্মগত ভাবে বলে, না, না, মা সাউ মোটেই ভীতু নন।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে এক ভীষণ পরীক্ষার সামনে পড়েছিলেন মা সাউ। হোন দাৎ-এর তোরণ শীর্ষে দুটি সেনা একদিন বাজী ধরে নিরপরাধ একটি মেষপালক বালককে পাহাড়ের ধারে গুলি করল। বাজী ছিল একটি সিগারেট। গ্রামের লোক ক্ষেপে উঠল। ওরা দল বেঁধে সেনা শিবিরের দিকে এগিয়ে চলল সেই মৃত বালকের দেহ নিয়ে। হাই থেপের স্ত্রী আর জননী সাউ চলল সেই মিছিলের পুরোভাগে। 'দোষীর শাস্তি চাই'—এই ছিল ওদের দাবী। তাম চেন আর নাগান নদীর অপর পারে একটি গুপ্ত ঘাঁটি থেকে সব দেখছিল। সেনারা ওদের পথ অবরোধ করল। জনতার দাবীর জবাবে বলা হল একটা উড়ো গুলি গিয়ে ছেলেটার গালে লেগেছে। জনতা বাধা না মেনে এগিয়ে চলল—এমন সময় হোন দাৎ সেনা

শিবিরের কম্যাণ্ডার স্যাম রাইফেল নিয়ে এগিয়ে এসে জননী সাউ-এর বুকের কাছে ধরল। স্যাম চেঁচায়-- বুড়ি ফিরে যাও, নইলে তোমাকে ঠাণ্ডা করে দেব।

স্যামটা রক্ত পাগল নরপশু, সে ঠিক সাউকে গুলি করত। জননী সাউ কি যেন বললেন, তাম চেন তা শুনতে পায়নি। এমন সময় ঐ শিবিরের কম্যাণ্ডার স্যামের মা মিসেস কা সোই এসে দাঁড়ালেন স্যামের রাইফেলের সামনে। জননী সাউ এই সুযোগে সঙ্গীদের নিয়ে আরো এগিয়ে গেলেন।

শেষ পর্যন্ত শত্রুপক্ষ সেই খুনে সৈনিকটাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হল। স্যাম কথা দিল ওকে কারাগারে রাখা হবে। ফেরার পথে তাম চেন জননী সাউকে জিজ্ঞেস করেছিল, স্যাম কি বললেন?

সাউ বললেন, আমাকে যদি গুলি করো স্যাম তাহলে তা তোমার মা মিসেস কা সোইকে গুলি করার সামিল হবে। আর মিসেস কা সোই বললেন, সাউকে গুলি কোরো না, আমার বুকে গুলি করো— আমার বুকেই গুলি করো স্যাম।

স্যাম একেবারে খ্যাপা কুকুর. কিন্তু নিজের মাকে গুলি করতে তার হাত কাঁপলো।

জননী সাউ-এর দিকে তাকিয়ে তাম চেনের মনে হয় যেন গত কাল এই ঘটনা ঘটেছে। জননী সাউ স্যামের রাইফেলের সামনে দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন।

তাম চেন প্রশ্ন করলেন, মা, তুমি স্যামের বন্দুককে ভয় করোনা মা, তবে প্লেনে এত ভয় কিসের?

—আমি প্লেনের ভয় করি না। আমি আমার সন্তানদের জন্য ভয় করি, তবে আমি এখন সহজে মরছি না। আমি নিজের চোখে উত্তর দক্ষিণের সংযুক্তি দেখে যাব। আর প্রেসিডেণ্ট হো-র মুখ নিজের চোখে দেখব। এই দুটি দৃশ্য দেখে তবে চোখ বুজব।

—কিছু ভেবো না মা, সে দিনের আর দেরী নেই।

—তাম চেন, সত্যি ?—সত্যি বলছ বাবা ?

এই প্রশ্ন বাব বার করার অর্থ আবেদন ভবা চোখে জানাক্স চেষ্টা—নতুন কি খবব জানো ? পার্টি কি বলে ? আমাকে বলো। আমিও আনন্দেব অংশভাগী হই।

জননী সাউ-এর ধাবণা, তাম চেন সব জানে। অন্য সবায়েব চেয়ে বেশী বোঝে।

তাম চেন বলে—হা, মা, অন্ধবাব দিন শেষ হয়েছে। তবে আমাদের লডতে হবে, প্রাণপণে লডে ওদেব তাড়াতে হবে। যেমন একদিন ফবাসীদেব তাডিয়েছি।

জননী সাউ হাতটা কোলেব ওপব নামিযে গলাব স্বব নীচু কবে বলেন—সবই তো বুঝি, তবে , জিভ দিযে একটা আওযাজ কবে আবাব বলেন আমাব ভাবনা তোমাদেব সবাযেব জন্য। তোমাদেব সব বযস কম, ঘব সংসাব ছেডে ছডিযে বেড়াচ্ছো আমাব এই বুডো হাড, তবে এটা জেনো তোমবা যেখানেই যাও আমি তোমাদেব সঙ্গেই থাকব। আমি তোমাদেব বাজনীতিক লডাযেব সামিল হব. সেনাদেব জন্য বান্না-বান্না কবব।

সহসা জননী সাউ বঝতে পাবেন যে কোযেন এখনও ওঁব কাঁধেব ওপব মাথা বেখে আছে। হালকাভাবে তাব গাযে হাত দিয়ে জননী বলেন কি বে এভাবে দাডিয়ে থাকলে হবে ? মাছটা বানিযে ফেল, দেবী হযে গেল যে। এদেব খাবাব তৈবীব সময় হযে গেল যে।

কোযেন ধীবে ধীবে তাব মুখটি মাব কাঁধ থেকে তুলে নিযে বান্নাঘবেব দিকে চলে যায়। নাগান ওব পিছু নেয, তাব হাত ধবে চলল থুয়া।

কোযেন মাছটা বানাতে বানাতে প্রশ্ন কবে এ জামাটা কাব থেকে ধাব কবেছ ?

কমবেড থাম।

—আমি তোমাকে যেটা দিয়েছিলুম ?

– সেটা সাথীদের দিয়ে দিয়েছি।

– আবার !—মাছটা ভালো করে কুটে ধুয়ে কোয়েন বলে—জানো সু-র স্বামীর চিঠি এসেছে।

—উত্তরাঞ্চলের অবস্থা ভালোই।

কোয়েন ভ্রূ কোঁচকায়—খারাপ হবে কেন? পড়াশোনা শিক্ষা দীক্ষা, ওদের কিছুর অভাব নেই। সান লোকটা ভালো। আমার করুণা হয় ওর জন্য। স্ত্রী কন্যার জন্য ওর কি চিন্তা জানো—থুয়ার লেখাপড়া, তারপর গলার স্বরটা নামিয়ে বলে—আমাদের কথাও লিখেছে জানো।

আমাদের কথা কি করে জানলো?

—কেন, সু লিখেছিল। জানো সান ওকে আমাদেরটা চিঠি পাঠিয়েছে। তোমার মত নয়, তোমার একেবারে আইন যে চিঠি ফিটি লেখা চলবে না।

নাগান নিজের জামাটা খুলতে খুলতে বলে—আবার বলো, সত্যি বলছ আমি তোমাকে লিখিনি চিঠি?

কোয়েন হাসে, জবাব দেয় না। নাগান ওকে আরো জোরে টানে। কোনো জবাব নেই। ওর পাঁজরায় আঙুল দিয়ে কাতুকতু দেয় আঃ কি হচ্ছে! আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে যে, নাগান -কি হচ্ছে?—হ্যাঁ আমাকে তুমি সব শুদ্ধ একখানা চিঠি লিখেছ বটে।

কখানা—? নাগান ও বার কাতুকুতু দেয়।

—দুখানা—দুখানা।

থুয়া হাততালি দেয়। নাগানকে উৎসাহ দেয়। মেসোমশাই আবার, আবার কাতুকুতু দাও—

কোয়েন দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বলে—আবার দুষ্টু মেয়ে, তুমিও মেসোর দিকে না? আচ্ছা আমি আর তোমার সঙ্গে খেলব না।

থুয়া নাগানের হাত ধরে বলে—বেশ তো আমি নাগান মেসোর সঙ্গে খেলা করব।

থুয়া নাগানকে জড়িয়ে ধরে বলে—মেসো, তুমি কি এখনই চলে যাবে? আমার সঙ্গে পরশু পর্যন্ত খেলতে হবে, পরশু—তরশু—নরশু—কেমন?

" বাইরে পদধ্বনি শোনা যায়—জননী সাউ এসে রান্নাঘরে ঢুকলেন। নাগান সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দেয়। সাউ প্রশ্ন করেন—এবার কত দিন ধরে থাকবে নাগান?

নাগান জবাব দেয়—পরশু পর্যন্ত।

সাউ জেনে নিলেন মাছের তরকারি কেমন হবে? চিংড়ি মাছের কি হবে?

যাবার সময় বলে গেলেন—আমাদের সুনাম তোমার হাতে'

সাউ জানেন. কোয়েন আর সু দুজনেই ভালো রাঁধতে পারে। বার বার তাদের বলেছেন—আমরা গরীব. আমাদের চুনো মাছটাও ভালো করে রান্না করে দেওয়া চাই।

চার

সেই রাতে যখন আনন্দের স্রোত বইছে সেই সময় পার্টি সেলের সেক্রেটারি হাই থেপ এসে হাজির হলেন। হাতে ব্রীফকেস, গলায় জাপানী ট্রানজিস্টর ঝোলানো। এসেই প্রশ্ন—নাগান কি এই এলে? তাম চেন কোথায়?

—সব এখানে।

এমন সময় তাম চেন এক কাপ চা এনে সামনে রাখল। হাই থেপ হেসে কাপটি উঠিয়ে নিলেন, বললেন তোমাকেই খুঁজে মরছি। জানো এই যে মু-র জমির পুনর্বণ্টন, সে কাজটা তেমন সোজা নয় মোটেই।

তাম চেন বলল -আমি কি কোনোদিন বলেছি যে সহজ?

হাই থেপ শব্দ করে এক চুমুকে চা পান করে বলেন, তোমার সঙ্গে দু একটা পরামর্শ করা প্রয়োজন। যেমন ধরো— ।

তাম চেন বলল—থামো। আজ এখানে থাকো। আমাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করো, বিশ্রাম করো। কথাবার্তা কাল হবে কাজের চিন্তা ভুলে যাও।

হাই থেপ তিন কাপ চা শেষ করলেন। এমন সময় জননী সাউ এসে প্রবেশ করলেন, বললেন --এই যে হাই থেপ বেশ বেশ। তা ওরা কোথায় বা-রেন, নাম টান ?

জানি না মা, আমি সোজা বাড়ি থেকে আসছি।

আমি ওদের খবর দিয়েছিলাম এখানে খাওয়া-দাওয়ার জন্য। তা কোনো খবব নেই।

ওদের জন্য ভেবো না মা !

এই সময় কোয়েন দুহাতে দুটি গরম ডিস নিয়ে ঘরে ঢুকল। পুরুষরা তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে ওকে পথ করে দেয়। মাদুরের ঠিক মাঝখানে সে এক ডিস কাঁকড়ার তরকারি আর এক ডিস চিংড়ি মাছের কারি সাজিয়ে রাখল। এমনই সুগন্ধ যে সবার মুখে জল ঝরছে। বিশেষতঃ চিংড়ি এক একটা বুড়ো আঙুলের মতো বড়ো, তার ওপর গোলাপী ঝোল, টমাটো সস দিয়ে রং করা। আর একটি বড় ডিসে প্রথম পদ সাজিয়ে নিয়ে এল। পেঁপে সিদ্ধ করে ভিনিগারে ভিজিয়ে এই পদ বানানো হয়েছে, তার সঙ্গে আছে মাছের কুঁচি আর বরবটি কড়াই।

হাই থেপ পাত্রগুলি পরীক্ষা করার জন্য এগিয়ে এল, তারপর ভালো করে দেখে সুকে জড়িয়ে ধরে বলে – মা, কি করেছ ? এ যে সব অপূর্ব স্বাদের বস্তু ! আমি আমার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে আসব, তোমাদের দুই বোনের কাছে রান্না শিখে যাক। তবে এই যদি সব হয় তাহলে আমাদের খেতে বসতে আপত্তি আছে।

কোয়েন তাড়াতাড়ি বলে—এখনও ভাজা মাছ বাকী আছে।

-- হাই থেপ চেঁচিয়ে ওঠে –ভাজা মাছ? তথাপিও না, ভাজা মাছ হলেও আমরা বসতে রাজী নই।

কোয়েনের চক্ষু ছানাবড়া। বলে কি ওরা?

সু বলে ওঠে--তুই মুখ্যু। তুই কি জানিস না ওদের। তোকে খেপাচ্ছে। বুঝলি না

হাই থেপ হেসে ওঠে তোমার বুদ্ধি আছে মা, যাও ত মা এখন আমি যা চাই একটু তাড়াতাড়ি এনে দাও

সু হেসে উঠে মার দিকে তাকায় -

জননী সাউ বললেন বেশ, ছোট কামরা থেকে একটা বোতল নিয়ে আয়, নইলে আবার হাই থেপ হাঙ্গার স্ট্রাইক করবে।

সু তাড়াতাড়ি ছোটো কামরা থেকে একটা বোতল নিয়ে এল।

তিনটি গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে আওয়াজ করে মদ্যপান সবে শুরু হয়েছে এমন সময় বাইরে কয়েকটি দ্রুত পদক্ষেপ এবং সেই সঙ্গে দরজায় করাঘাত শোনা গেল। তান আর বা-রেন দরজা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকলো।

তান মৃদু গলায় বলে আমরা শুনলাম যে শত্রুদল ট্রি টনে প্রায় হাজার খানেক সেনা জড়ো করেছে আগামীকাল নিশ্চয়ই খতম করার কাজ শুরু হবে। তবে ঠিক কোথায় তা জানা নেই।

তাম চেন প্রশ্ন করে কতজন হবে ঠিক? এক হাজার?

তান মাথা নেড়ে বলে এক ব্যাটালিয়ন রেগুলার সৈন্য, এক ব্যাটালিয়ন সিভিল গার্ড আর এক কোম্পানী রেনজার্স।

বা-রেন বলে স্যামের নেতৃত্ব, আমাকে ওরা খাঁটি খবর দিয়েছে।

তাম চেন নিঃশব্দে শুনে বোতলে ছিপি এঁটে সু-র হাতে সেটি দিতে দিতে বলে তাই যদি হয় তাহলে এই এক পাত্রই যথেষ্ট। তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়া যাক, সু আর কোয়েন তোমরাও খেয়ে নাও। ভোরের আগে আক্রমণ শুরু হবে না, তবে স্যামের দল হয়ত আগেও আঘাত হানতে পারে।

—তবে বুড়ো শালিককে সম্প্রতি এদিকে দেখিনি।

—তোমাদের সামনে তার আসার কি দরকার আছে?

তাড়াতাড়ি করে খাওয়াদাওয়া সারা হল, জননী সাউ ডিসগুলি সরিয়ে নিলেন সবকটি পুরুষ বক্রাকারে বিছানার ওপর বসে পরামর্শ করে। হাই থেপ মাথায় একটি রুমাল বেশ শক্ত করে বেঁধে নিয়ে বলে বেশ বোঝা যাচ্ছে ওরা এখানেই আসছে। আমাদের আলোচনা সংক্ষেপ করে এখনই তোড়জোড় করা দরকার। আমার আদেশ সব শুনে নাও বা বেন এখনই গেরিলা বাহিনী সাজিয়ে নিয়ে তাদের খনি ও অন্যান্য ঘাঁটিতে খাড়া করে দেবে, আমার স্ত্রী একদল আন্দোলনকারী সাজিয়ে নেবে। শত্রুকে একেবারে খেপিয়ে দেওয়ার আগে একটু আইনসঙ্গত লড়াই করা ভালো। আমি আমার বউকে বলি।

তাম চেন পা তুলিয়ে বলে হাই থেপের সঙ্গে আমি একমত, কিন্তু হাজার লোকও বড় কম নয়. আমাদের আণ্ডার গ্রাউণ্ডে শেলটারের অবস্থা কি? পালাবার জায়গা ঠিক আছে ত?

না, লুকোবার জায়গা বেশী নেই সামান্য কিছু লোক ধরতে পারে, এমন জায়গা আছে। বালিয়াড়ির মাটিতে নতুন খাদ খোঁড়ার সুযোগ সামান্য। যতবার খোঁড়া যায় ততবার বুজে যায়। আমার মনে হয় তরকারি ক্ষেতে সামনে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করা যাবে। যদি অবস্থা বেগতিক হয় তাহলে একেবারে গহ্বরে আশ্রয় নেওয়া যাবে।

তাম চেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার মনে উদ্বেগের ছায়া নেমেছে। সে বলে- আমাদের এই লুকানোর জায়গার সমস্যাটা সমাধান করতে হবে—নইলে আমরা তেমন মোকাবিলা করতে পারব না।

বা-বেন বলল কিন্তু এই গুহাগুলি আত্মরক্ষায় অতি সুন্দর

আশ্রয়। এক একটায় অন্ততঃ একশটা মানুষ ধরে যায়। গেলবারে ত ওই ব্যবস্থাই ছিল।

-তা বটে, তবে এবার অবস্থাটা অন্যরকম। আমি মানি যে হোন দাৎ-এর গুহাকন্দব প্রতিরক্ষার সহায়ক---কিন্তু শুধু খাদের কথা ভাবলেই চলবে না। গ্রামের ভিতর যখন আত্মগোপনের জায়গা নেই, তখন আমাদের এই সমাধান মেনে নিতে হয়। তবে ভবিষ্যতে শুধু গুহাই একমাত্র আশ্রয় ভেবে রাখলে চলবে না।

নাগানের দিকে তাকিয়ে তাম চেন বলে -তুমি ও তোমার প্রচার গোষ্ঠীকেও গেরিলাদের সঙ্গে কাজ করতে হবে।

বেশ, আমাদের তিনটি মাস রাইফেল আছে, তিনটি টমসন আর পনেরটি এম কে ৩ গ্রেনেড। সবই লড়াই করার উপযোগী অবস্থায়।

বা-রেন উৎসাহভরে নাগানেব হাত চেপে ধরে বলে—বাঃ, ভারী আনন্দেব কথা।

হাই থেপ বলে ওঠে, কিন্তু আমার মনে হয় তাম চেন এখানে না থাকাই ভালো।

তাম চেন একটু ভেবে নিয়ে বলে--আমি এ কথা মানি না. আমি তোমাদেব সঙ্গেই থাকব।

তারপব হাই থেপকে কাছে টেনে নিয়ে মৃদু গলায় বলে, আমি গ্রামে থেকে বাজনৈতিক লড়াই-এ মদৎ দেব। একটা বাড়ির কথা ভাবো, যেখানে আমাব থাকা চলে। এইটেই সব থেকে ভাল কাজ হবে মনে হয়।

চোখে মুখে খুশির হাসি টেনে হাই থেপ বলে--আমার বাড়ি। আমার বউ সবরকম রাজনৈতিক আন্দোলন গোষ্ঠীর চার্জে। তোমার সাহায্য পেলে সে খুশি হবে। আমাদের লুকোনোর জায়গাটাও একেবারে নিরাপদ, তাই ভালো।

তাম চেন বলল, কাউকে লিন কয়না গ্রামে পাঠাও আমার রক্ষী

দাৎ-কে ডেকে আনুক। তার মানে আরেকটি রাইফেল, এ ছাড়া ওর টিপও চমৎকার।

নিরাপত্তার ভার তানের ওপর। সে গলার স্বর নামিয়ে বলে, গ্রামের ভিতব ওদের চর আছে। বা ফি বলে, একজন বিভীষণ আছে তার আমরা কোনো ব্যবস্থা করিনি। সে একেবারে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে আছে। ওকে নিয়ে কি করা যায় স্থির করতে হবে, নইলে -।···অবশ্য ওর ওপর নজর রাখা আছে।

-ওকে কয়েদ কবতে হবে। ঐ ভেড়ীর মালিকটা সর্বনেশে।

—আর তেমনই ওর বউটা।

তখন চেন সবিস্ময়ে বলে আমি ভেবেছিলাম তোমরা কাজটা সেরে রেখেছ। তার কাছে কোনো নতুন খবর পেয়েছ?

— তেমন কিছু নয়।

ও কি জানে তোমরা ওর ওপর নজর রেখেছ?

--না, তা মনে হয় না। তান জবাব দেয়।

হাই থেপ বলে আমাদের সাবধানে কাজ করতে হবে। ওর বাড়িটা গ্রামের অপর পারে! তাছাড়া ও শত্রুদের কাছেই থাকে। গ্রামেই খবর নিতে হবে কোনো ডিস্ট্রিক্ট সোলজার আজ বিকেলে ওর কাছে এসেছিল কিনা।

নাগান বলে- আমি একটু সাহায্য করতে পারি। ও আমাকে জানে না।

—বেশ, তাই কবো। এখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, ওব বাড়ি পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাবে।

নাগান তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে।

কোয়েন রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এসে পিস্তলটা প্রিয়তমের হাতে ধরে দেয়। তরুণ নাগান কোমরে বেল্টটা বেঁধে পিস্তলটা এঁটে নেয় তারপর তানের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়।

হাই থেপ হুকুম দেয়—ওকে গ্রেপ্তার করে একেবারে সোজা গুহায় নিয়ে যাবে।

পথ চলতে চলতে নাগান বলে, একটা কৌশল করতে হবে। জানো তান ওকে গ্রেপ্তার করার আগে ওর কাছ থেকে কিছু গোপন কথা বের করতে হবে।

নাগান তানের কানে কানে ফিসফিস করে কি বলে আর তান চেঁচিয়ে ওঠে- -চমৎকার।

নাগান বলে, আমাদের কাছে তাঁবেদার অফিসাবদের ইউনিফর্ম আছে। কিছু ভেব না ওকে ঠিক পাকড়াও করব। ও তোমাকে জানে, তুমি বরং বাইরে গার্ড হিসাবে পাহারা দেবে, আর আমরা সব কাজ ফতে করে দেব।

পাঁচ

সেই সন্ধ্যায় ট্রিটনের ছোট্ট শহরটি সহসা প্রাণময় হয়ে উঠল। ট্রাকের পর ট্রাক। সেনা বোঝাই ট্রাক চলেছে, এরা আসছে রাচ গিয়া থেকে। সেইসব গাড়ির ধুলোয় কৃত্রিম মেঘ রচিত হচ্ছে। বড় রাস্তার ওপরকার সরাবখানা, দোকানপত্র [illegible] গাড়ির মাথায় গিয়ে ধুলো জমছে। সহসা গাড়িগুলি থামল। সেনাগুলি লাফ দিয়ে মাটিতে নামল।

খাকি উর্দি পড়া রেগুলার সেনাদল, কারও বা অঙ্গে কামুফ্লাজ করা ব্যাট্‌ল্ ড্রেস, চামড়ার বুট আর ক্যাম্বিসের জঙ্গল বুট পায়ে সেনাদল ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে মার্চ করে চলে সেই ধুলোর অন্ধকারে। ওদের বুটের ভারী আওয়াজে মেদিনী টলমল।

দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে নগরীর লোকজন দেখছে এই দৃশ্য এবং আস্তে আস্তে বাঁকা মন্তব্য করছে। এদের অনেক রেনজারের মুখ বেশ পরিচিত, কিন্তু কেউ ধরা দিতে চায় না যে ওদের সঙ্গে জানাশোনা

আছে। যে সব রেগুলারকে সায়গন থেকে আনানো হয়েছে তারা কৌতূহলভরে দোকান ঘর আর বাড়িগুলি দেখছে। তবে রেনজারদের মুখভাব কঠিন। ওদের চোখের দৃষ্টি শীতল, ওদের টমি বন্দুক আর রাইফেলগুলি একেবারে আঘাত হানার জন্য তৈরী।

রেনজারদের কম্যাণ্ডার লেফটেন্যান্ট স্যাম ভারী পায়ে দলের পিছনে হাঁটছেন। শয়তানের মত দুটো চোখ, এত ছোট দুটি চোখের তারা যে সেই তারা দুটিকে কালোর চেয়ে বেশী শাদাই দেখায়। ওর কামুফ্লাজ স্যুট দেহের আয়তন মাফিক, শরীর পেশীবহুল। গলা আর কাঁধ রোদের হাত থেকে ত্রাণ করার জন্য মাথায় তিনটি ঝালরওলা টুপি, লোকে ব্যঙ্গ করে বলে 'তিনপরদার টুপি'। ওর কোমরে একটি প্রকাণ্ড কোলট—১২ (পিস্তল) ফুলে উঠেছে, চামড়ার খাপটার সঙ্গে ওর গায়ের চামড়ারও মিল অনেক, কাঁধে একটা রাইফেল ঝোলানো আর একটি তলোয়ার জাতীয় বুস-নাইফ, জঙ্গল কাটা দা। ওর দলবলের সকলের ঐ একই রঙের উর্দি পরা, প্রত্যেকের ঘাড়ে একটি করে রাইফেল, একটা মার্কিন ছোরা আর একটি টমি বন্দুক। এর ফলে সমগ্র আবহাওয়াটা করাল ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।

স্যাম সহসা রাস্তা ছেড়ে একটা সরাবখানায় ঢুকে পড়ে।

ভীষণদর্শন চীনা মালিকের চোখের ওপর সে একটি বীয়রের বোতল টেনে নিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর নিজের ছুরিটা টেনে নিয়ে বোতলের ছিপিটা খুলে ফেলে সেই ফেনায়িত গরলের দুই-তৃতীয়াংশ মুখে ঢেলে ফেলে ওর সামনে যে সৈনিকটি ছিল তার হাতে প্রসাদ দিল। লোকটা পরমানন্দে বাকী পদার্থটুকু তার সর্দারের মত ভঙ্গী করে গলায় ঢেলে ফেলে। কর্তার কাছে এই রকম অনুগ্রহ পেতে সে অভ্যস্ত মনে হয়।

ঠিক এই সময় কম্যাণ্ডার আদেশ দিলেন—হলট্, থাম। স্থানীয় সামরিক ঘাঁটিতে মাত্র দুই ব্যাটালিয়ন থাকার জায়গা আছে। তাই ঠিক হল রেগুলার দলের দুটি ব্যাটালিয়ন সেই কামরায় থাকবে আর

মিলিসিয়া ও রেনজার্সের বাকী দল থাকবে ধানক্ষেতে ছাউনি খাটিয়ে। ধানক্ষেত এখন শুকনো কাঠ ফাটছে।

স্যাম রাগে গর-গর করে—এটা আমার নিজের দেশ, আর এখানে এসে আমাকে মাঠে শুতে হবে!

ছাউনিতে ঢুকে স্যাম ওর সার্টটা খুলে ফেলে। ওর সারা দেহে অজস্র তাবিজ আর মাদুলি। নানারকম দুষ্টগ্রহ কাটানোর জন্য এই সব করতে হয়েছে। লাল আর হলুদ রং-এর তাগা কোমরে বাঁধা। গলায় একটা সোনার চেন ঝুলছে, তার লকেটটায় একটি দানবের মুখ হাতির দাঁতে খোদাই করা। একটা ধূসর রঙের ক্যানভাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে স্যামের লক্ষ্যই নেই যে সিগারেটটা পুড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সিগারেটের শেষ প্রান্ত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বসে।

একটা বাচ্চা আরদালি এসে বলল—বড়দা, ডিনার তোয়ের।

লেফটেন্যাণ্ট স্যার বলার চেয়ে—বড়দাটাই স্যাম একটু পছন্দ করে। তাই সবাই বড়দা বলে ডাকে।

স্যাম বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে উঠে আরদালিকে অনুসরণ করে। একটি ক্যানভাসের ওপর পুরানো খবরের কাগজ বিছিয়ে খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার ওপর একটি রোস্ট চিকেন, দু টুকরো মোটা মোটা পাঁউরুটি, অল্প সার্ডিন মাছের খোলা টিন।

স্যামের মুখ কালো হয়ে গেল। সে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করে—মাল কই? সব শেষ?

একটি মস্ত বড় টিনের পাত্র এনে আরদালি তাড়াতাড়ি বলে - এই যে বড়দা, এনেছি।

স্যাম সেটি তুলে নিয়ে ছিপি খুলে খানিকটা চুমুক দিয়ে অপেক্ষারত সৈনিকের হাতে বাকীটা দিয়ে লুব্ধের মত চিকেনটা ছিঁড়তে থাকে।

একজন সৈনিক প্রশ্ন করে—বড়দা, কাল হোন দাৎ-এ পৌঁছে একবার তোমাদের বাড়ি যাবে নাকি?

স্যাম আর একপাত্র টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে

তারপর বলে—একবার যাব, বাড়ি গিয়ে মাকে আর বোনটাকে দেখে আসব।

আরেকটি সৈনিক বলল -কা মাই? এতদিনে বেশ বড়োসড়ো হয়ে উঠেছে না বড়দা?

স্যাম গম্ভীর গলায় বলে -তা প্রায় উনিশ বছর বয়স হল—।

—আচ্ছা শুনেছিলাম ওদের তুমি শহরে আসতে বলেছিলে, তা এল না কেন?

-আমরা এইবার হোন দাৎ বরাবরের মতো অধিকার করে নেব। তখন ওদের বলব আমার সঙ্গে এসে ঘাঁটিতেই থাক।

তারপর গলার স্বর একটু নামিয়ে বলে হোন দাৎ-এর জীবনই ভারী মজার। আমি ওখানকার পোস্ট কম্যাণ্ডার ছিলাম যখন তখন এখনকার চেয়ে অনেক মজায় ছিলাম বে। সব রকমের রসাল ফল, আর শুকনো মোষের মাংস, যত পার খাও। অজস্র মেয়ে, আবার কতকগুলো ভারী সুন্দরী। কি চমৎকার সব বুক। এক একটা যেন নারকেলের মত বড়, তোমার ঐ ছোট্ট হাতে কুলোবে না- !

সৈনিকরা সম্ভাব্য আনন্দের আশায় খিক্ খিক করে হাসে। সবাই জানে আগামীকাল এই ভূ স্বর্গে ওরা পদার্পণ করবে। ওদের মধ্যে কিছু অবশ্য সম্ভাব্য মৃত্যুর কথাও ভাবছিল। তবে লুট-পাট, নারীধর্ষণ ইত্যাদি লোমহর্ষক চিন্তা তাদের কিঞ্চিৎ উত্তেজিত করেছে।

ক্রমে রাত অন্ধকার হয়ে আসে। পানোন্মত্ত সেনাদল যে যার চিন্তায় আত্মমগ্ন হয়ে পড়ে থাকে।

তু দোনের বাড়ির এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে নাগান ও তার বাহিনীর আরো দুজন ট্রং ও টোই রেনজারদের ইউনিফর্ম পরছিল। নাগান একজন সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্টের পোশাক পরেছে -মাথায় সেই 'তিন পরদওলা টুপি' পরেছে। সঙ্গীদের ছদ্মবেশ ধারণ শেষ হতেই নাগান

তাদের সুমুখে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের সুরে বলে—অল রাইট? সব ঠিক তো?

—ভারী সুন্দর হয়েছে। বা ফাই নিশ্চয়ই ফাঁদে পা দেবে। ট্রং আর টোই দুজনের কাঁধে দুটি টমসন বন্দুক ঝোলানো। নাগান ওর কোলট—১২ পিস্তলটা বার করে, বুলেটগুলি গুনে নেয়। তারপর পিস্তলটা খাপে পুরে আটকে নেয়। ওদের পথ প্রদর্শক তানের বন্দুক নেই, একটা বড় ছুরি আছে, আর কোমরে একটা ডোরা কাটা রুমাল বাঁধা।

নাগান বলে চলো এইবার যাই।

ভ্যানখানা গ্রাম অতিক্রম করে ওরা ধানক্ষেত পার হয়ে ভ্যান হিয়েপের দিকে চলল। এই গ্রামের প্রবেশ পথে পৌঁছে তান বলল, তোমরা এইখানে দাঁড়াও আমি একটু চারদিক দেখে আসি।

একটু পরেই সে ফিরে এসে চুপি চুপি বলল- সব চুপচাপ। চলো এইবার যাওয়া যাক।

তানকে অনুসরণ করে সবাই চলতে থাকে। নদীর ধার অতিক্রম করে দূর থেকে বা-ফির মেছো ভেড়ির ছাউনির আলো দেখা গেল। অতি দ্রুতগতিতে জল সমুদ্রে চলে যাচ্ছে, প্রচণ্ড তার গর্জন আর তেমনই তীক্ষ্ণ তার স্রোত। নদীর জলতরঙ্গে আলোর ছায়া পড়ে আন্দোলিত হচ্ছে।

-আজ দেখেছি মাছের ঘুনি বসায়নি মাছের ঘুনি বসলে তার ওপর লাল আলো জ্বলে, এটাই রীতি।

তান বাড়ির কাছে পৌঁছে নীচু গলায় বলে -আছে। বা-ফাই বাড়িতেই আছে।

—বেশ. তুমি বাইরে থাক, আমরা আলাদা যাই। নাগান আর তার দুই সঙ্গী দ্রুত এগিয়ে গেল। সাহসী নাগান ইতস্তত না করে সোজা একেবারে দোর গোড়ায় হাজির। তার পিছনে ট্রয় আর টোই। দুটি কাঠের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নাগান কান পেতে

শোনে ভিতরে কথাবার্তা চলছে কিনা। কণ্ঠস্বর শোনা গেল বটে, তবে ঠিক যে কি তা বোঝা গেল না। নাগান দরজায় ধাক্কা দিতেই ভিতরের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। নাগান আবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে প্রশ্ন করে--মিস্টার বা-ফি বাড়ি আছেন নাকি?

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর ভেতর থেকে মুরুব্বির ভঙ্গীতে প্রশ্ন এল—কে? কে ডাকে?

—আমরা বন্ধু! দরজা খুলুন।

নাগান চটিজুতার শব্দ পায়। খিল খুলে দরজাটা একটু ফাঁক হল। মেদস্ফীত একটি স্ত্রীলোকের মুখ লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল। স্ত্রীলোকটি আলোটা একটু উঠিয়ে আগন্তুকদেব চেনার চেষ্টা করে। নাগান ওকে আগে কখনও না দেখলেও অনুমানে বোঝে এই হল বা-ফিব স্ত্রী।

সে প্রশ্ন করে—মাদাম, বা-ফি বাড়ি আছেন নাকি?

মহিলাটি একটু চোখ কুঁচকে বলে—হ্যাঁ আসুন মশাই, ভিতরে আসুন। নাগান তার নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল বেখে মহিলাটিকে ইঙ্গিত করে, বেশী জোরে কথা বলবেন না। ওদের তিনজনকে ঘরে আসার সুযোগ করে দিয়ে মহিলাটি এগিয়ে যেতেই, নাগান দরজাটা চেপে বন্ধ করে দেয়।

ঠিক এই সময় বাঁ দিকেব কামরার পবদাটা সরে গেল, আর একটি টাক মাথা দেখা গেল। ইনিই ভেডির মালিক। পঞ্চাশ ঘেঁষা বয়স, মোটা ভ্যাপসা চেহারা, গায়ে একটা সাধারণ মেরজাই। দেখতেও লোকটা বোকা বোকা—যেন এই ঘুম ভেঙে উঠল। নাগান মাথা নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে বলে—মিঃ বা-ফি?

বুকের ওপর ছুটি হাত জড়ো করে লোকটি মাথা নত করে বলে--হ্যাঁ, স্যার।

এই শ্রদ্ধাপূর্ণ ভঙ্গিটা নাগানের কাছে শুভলক্ষণ মনে হল। সে বলে—আপনার সঙ্গে কথা আছে। আমার পরিচয় দিই। আমাকে

লেফটেন্যাণ্ট স্যাম পাঠিয়েছেন—এই বলে বাইরের দিকে অস্পষ্ট ইঙ্গিত করল—আমরা সাব-সেকটার থেকে এই আসছি।

—জানি, জানি। বসুন মশাইরা, বসুন। ভিতরে এসে অনুগ্রহ করে বসুন! এই বলে স্থূলাকৃতি মানুষটি পর্দা তুলে ধরলেন। ঘরে একটি বিছানা সাজানো, বহু ব্যবহারে বেশ পালিশ করা—দূরে আর একটি বিছানা। মশারি ফেলা রয়েছে।

নাগান বেশ করে জায়গাটি দেখে নেয়। তারপর বা-ফির দিকে তাকিয়ে লঘু ভাবে বলে—বাঃ, আপনি বেশ মজায় আছেন মনে হচ্ছে। আপনার মত এই সুখ আর শান্তি আমাদের কিন্তু নেই! ঐসব ভিয়েৎকঙরা নানারকম বীভৎস কাণ্ডকারখানা করেছে সম্প্রতি।

-আমাকে আর বলবেন না, লেফটেন্যাণ্ট। আমি আজই বিকালে শুনলাম আপনি আর সৈন্যদল এসে পেঁাছেচেন। আমি এবং আমার স্ত্রী স্বভাবতই অতিশয় উত্তেজিত হয়ে আছি। আপনাদের জন্য দিনরাত প্রতীক্ষা করে আছি। সত্যি, আমরা বেশ উদ্বিগ্ন হয়েই প্রতীক্ষা করেছি।

তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আদেশ করে—যাও একটু জল গরম কর।

তারপর চোখের তারা দিয়ে ইঙ্গিত করে চারদিক দেখিয়ে প্রশ্ন করে—তা মশাইরা কি সমস্ত আশপাশের অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছেন?

—নিশ্চয়।

—ধন্যবাদ! আমি তো ভেবেই পাই না আপনারা কি করে কাজ করেন।

এরপর একটা দিব্যি গেলে দাঁত কড়মড় করে বা-ফি বলে—এইবার আমাদের হাসবার সুযোগ আসবে। জানেন লেফটেন্যাণ্ট, ঐসব ভিয়েতকঙ কুত্তারাই এখানকার শাসক। আমি ওদের সবাইকে দেখিয়ে দেব, মেয়ে মদ্দ সবাইকে চিনিয়ে দেব। জানেন তো ওদের

আমি ভালোই চিনি। আপনি শুধু বন্দুকের ঘোড়াটা টিপবেন। আর ওরা সব পটপট করে কাঠ-ঠোক্‌রা পাখির মত লটকে পড়বে।

—এইজন্যেই তো মিঃ বা-ফি আপনার কাছে এসেছি' নাগান উৎসাহের ভঙ্গীতে বলে।

—চমৎকার! চমৎকার!

লোকটা ছ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সেলফ থেকে একটি আবলুস কাঠের ট্রে নামিয়ে নিল। একটা চায়ের সরঞ্জাম, তার গায়ে লাল ড্রাগন আঁকা, তারই পাশে রুবিস মার্কা সিগারেটের প্যাকেট। কয়েকটি সিগারেট বার করে যথেষ্ট বিনয়ের ভঙ্গি করে নাগানকে দিল সে। তারপর রান্নাঘরে চলে গেল। নাগান বুড়ো আঙুলের নখের ওপর সিগারেটটা ঠুকে নেয়। আগুনে একটা প্যান চড়িয়ে স্ত্রীলোকটি ঘরে ফিরে এল। নাগানের গা-ঘেঁষে তাকে ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে চোখটা অর্ধেক বুজে বলল—আপনারা স্যাব একটু অপেক্ষা করতে পারেন? এই কথা বলার সঙ্গে মোহ বিস্তার করে একটু চোখ মট্‌কায়।

নাগান তার বিস্ময় চেপে বলে—আমাদের হাতে এখন অনেক সময়, তেমন বেশী কাজ নেই।

তাহলে কি একটু মদ্যপান করবেন স্যার?

নাগান আত্মগত ভাবে বলে প্রত্যাখ্যান করি কি করে!

তারপর চোখে তৃপ্তির ভাব এনে মুখে হাসি টেনে বলে—আপনার এখানে কি কিছু গলদা চিংড়ি, বা কাঁকড়া আছে?

—দুঃখের বিষয় আজ তেমন টাট্‌কা কিছুই নেই। শুধু শুঁটকি মাছ আছে। তবে আমার মনে হচ্ছে আপনাদের একটু ডাক সুপ বানিয়ে দিই। বেশ বাচ্চা আর মোটা-সোটা হাঁস আছে।

এর পর জবাবের অপেক্ষায় না থেকে রান্না ঘরে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে—যাও, তাড়াতাড়ি ছুটে বেশ মোটাসোটা দুটো হাঁস নিয়ে এস।

প্যানের দিকে তাকিয়ে স্বামী বলে—বেশ তো। আমি বরং

লেফটেন্যাণ্ট আর ওঁর বন্ধুর জন্যে একটু জল গরম করে নিই। প্রায় হয়ে এসেছে।

ফুটন্ত গরম জল নিয়ে গিয়ে সে চায়ের পটে ঢেলে দিল। কিছুক্ষণ রাখার পর ছোট ছোট কাপে সেই চা ঢেলে দেয়। তারপর নিজের মোটাসোটা হাত দুটি ঘষে নাগান ও তার সঙ্গীকে চা-পানে আমন্ত্রণ জানায়।

লোকটার উৎসাহ দেখে নাগান মনে মনে বলে—বেটা বেজন্মা হাড় বেজন্মা।

লোকটা ততক্ষণ হাঁস দুটোকে কাটছে, আর তারা প্রাণপণে ভীষণ চেঁচাচ্ছে।

একটু পরে হাত-মুখ ধুয়ে লোকটা যখন ঘরে ফিরে এল তখন ওর গায়ে নানা রংয়ের একটা সারোঙ (আলখাল্লা জাতীয় পোশাক)। মাথায় যে দু চারগাছি চুল আছে সেই চুলগুলি বেশ পরিপাটি করে ব্রাস করেছে।

নাগান তাকে কাছে ডেকে বলে - এখন বলুন তো মিঃ বা ফি, সময় বাঁচানোর জন্যে আমরা কি সুপ আসার পূর্বেই কিছু কথাবার্তা বলতে পারি ?

—লেফটেন্যাণ্ট, আমি আপনাদের দাস।

—আপনার কাছে এই অঞ্চলের একটা ম্যাপ আছে। আছে না ?

এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে উঠে গিয়ে লোকটি একটি বাঁশের চোঙ্গা হাতে নিয়ে ফিরে এল। তারপর তার ভিতর থেকে এক টুকরো কাগজ বার করল। নাগান বা-ফির হাত থেকে সেটা নিয়ে ভালো করে খুলল। ট্রয় আর টং কাগজটার চারপাশে চারটি পেয়ালা বসাল, যাতে উড়ে না যায়। নাগান দেখল স্কুলের নোট বই-এর কাগজে কাঁচা হাতে বল পয়েণ্ট পেন দিয়ে মানচিত্রটি আঁকা। অক্ষম হলেও তথ্যের দিক থেকে নিখুঁত। বাড়ি, বাগান, এবং পাহাড় ঠিক ঠিক ভাবে চিহ্নিত।

বা-ফি সহসা নাগানের দিকে তাকায়। ওর চোখে ভয়ের আতঙ্ক। দরজাটা আগে থেকেই বন্ধ।

নাগান বলল—আপনি শান্ত থাকুন, আমাদের লোকজন চারদিকে পাহারা দিচ্ছে, কালই আমরা, হোন দাং আক্রমণ করব।

ভেড়ীর মালিক বলে—হাঁ, আমি তা জানি। এই বলে সারোঙটা কোমরের কাছে টেনে নেয়। তারপর সিগারেটের নিকোটিন রঞ্জিত আঙুল সেই ম্যাপের ওপর রেখে বলে, এইসব তারকাচিহ্নিত অঞ্চলে ভিয়েতকঙরা থাকে।

নাগান বলল—ও তাই নাকি! লাল তারকাচিহ্নিত অঞ্চল! বুঝেছি।

বা-ফি আবার সেই নোংরা আঙুল দিয়ে দেখায়—এই জায়গাটায় ওরা অস্ত্র বানায়। আমার রিপোর্ট হচ্ছে প্লেন থেকে আঘাত করে সব জায়গাটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়, তাতে ওরা পালিয়ে গেছে মালপত্র নিয়ে। অন্য কোথাও সরে গেছে। এইটা হোল হোন দাং-এর গুহা। আপনাদের এই অঞ্চলটায় সতর্ক হতে হবে। গতবার যারা ওখানে আশ্রয় নিয়েছিল তারা আমাদের সমস্ত আঘাত নস্যাৎ করে দিয়েছে। আমাদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এইবার গোড়াতেই গুহা থেকে পালাবার পথটা নষ্ট করতে হবে।

এই গুপ্তচরের কথা শুনতে শুনতে নাগান ভাবে কুত্তার বাচ্চা তুমি সর্বনেশে মানুষ। তোমার পাওনা তুমি পাবে।

লোকটার সব বলা হবার পর নাগান ম্যাপটা গুটিয়ে রাখে। তারপর ওর পিঠ চাপড়ে বলে—ভালো, আর কিছুই বলার নেই। খুব ভাল কাজ করছেন আপনি, আমাদের এবারকার অভিযান সফল হলে আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।

তারপর রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে বেশ দরাজ গলায় বলে—মাদাম, ডিনারের কত দেরী?

রান্নাঘর থেকে বা-ফির স্ত্রী উত্তর দেয় —যাচ্ছি যাচ্ছি, এই হয়ে গেল, আর দেরী নেই। খাবার তৈরী হয়ে গেছে।

একটু পরেই তৃপ্তিকর সৌরভ ছড়িয়ে ডাক সুপ এবং অন্যান্য ভোজ্য দ্রব্য এসে হাজির।

স্বামী একটু ঝুঁকে পড়ে গন্ধটা শুঁকে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

একটু পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বোতল ব্লু ড্রাগন মদ্য হাতে নিয়ে। চারটি আঙুলে চারটি কাচের গ্লাস সুকৌশলে ধরা। দাঁত দিয়ে বোতলের ছিপির ওপরকার লাল সেলুলয়েড ঢাকাটা খুলে অতিরিক্ত শব্দ করে বোতলটা খোলা হল।

ধোঁয়া ওঠা খাদ্যের পাত্রের দিকে তাকিয়ে নাগান সহসা প্রশ্ন করে আচ্ছা, মিঃ বা-ফি, বলুন তো কখনো মানুষের মাংস খেয়ে দেখেছেন কেমন খেতে?

লোকটি বোতলটি নামিয়ে রেখে মাথা নেড়ে বলে —না লেফটেন্যাণ্ট সাহেব, সাহস করিনি। তবে শুনেছি যেসব ভদ্রলোক খেয়ে দেখেছেন তাঁরা প্রশংসাই করেছেন। তবে আমার একটু গা ঘিনঘিন করে।

নাগান হো হো করে হেসে ওঠে। তারপর আধা গাম্ভীর্য আধা রসিকতায় বলে তাহলে কেন আপনার এই গুপ্তচর-বৃত্তির কাজে আপনার গা ঘিনঘিন করে না?

—দুটো এক নয় লেফটেন্যাণ্ট। যদি আপনি ঠিক ঠিক কাজ করেন তাহলে কোনও ঝুঁকি নেই - আমি মূর্খ নই, ধরাও পড়ি না। তারপর নিজের পেটের ওপর দুটি হাত রেখে বলে—কিছু মনে করবেন না, লেফটেন্যাণ্ট সাহেব, আপনি কি কখনও নরমাংসের স্বাদ পেয়েছেন···?

কি?

মানুষের মাংস মানে ?

—ও মানুষের মাংস—? তারপর টয় আর ট্রং-এর দিকে চোখ

মটকে বলে—ঐ দুজন অসুর নরমাংস চেখে দেখেছেন। না, আমার তেমন সুযোগ হয়নি -আমার তেমন আগ্রহ নেই। আমি অবশ্য লিভারটা ভালোবাসি, জানেন। আর যদি মেটলিটা একটু মদে রসিয়ে খেতে পারেন তাহলে একেবারে টি-বি'র আক্রমণ এড়ানো যায়। আচ্ছা, আপনি যদি একটু পান, চেখে দেখবেন !

লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে মাথাটা নেড়ে বলে -সত্যি কথা বলতে কি স্যার, আমার একটু খারাপ লাগে। তবে ধরুন যদি তেমন সুযোগ হয়, না বলবো না। যে ভদ্রলোক চেখে ভাল বলেছেন তাঁর কথার সত্যতা যাচাই করার জন্যই না বলব না।

—বেশ, আমি আপনাকে দু-এক কিলো পাঠিয়ে দেব। কালই কিছু পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।

তারপর সহসা যেন মনে পড়েছে এই ভঙ্গীতে বলে হ্যাঁ, ভাল কথা বলতে ভুলে গেছি। আপনার সহকারীর কথা, যে আপনাকে সাহায্য করে—

আমার জেলেরা ?

নাগান মাথা নাড়ল।

বা-ফি বলল আমার কোনও সহকারী নেই। আমি এ বিষয়ে খুব সতর্ক, কাউকে সঙ্গে নিই না। আমরা নিজেরাই কাজ করি, আমি আর আমার স্ত্রী।

নাগানের মনে হল নাটক আর বেশী বাড়ানো উচিত নয়। ঢের হয়েছে। একটু বেশীই হয়েছে, রক্ত টগবগ করে ফোটার পক্ষে যথেষ্ট। টয় আর ট্রং-এর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করে।

বা-ফি গ্লাসে আরেকটু মদ ঢালার উদ্যোগ করছিল। নাগান ওর কাঁধে চাপড় দিয়ে বলে—বন্ধু ! বেশ হয়েছে সব। তোমার ঐ পচা মদ কেউই ছোঁবে না।

তারপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে বলে—এই প্রহসন অনেক গড়িয়েছে। আমি তোমার প্রিয় লেফটেন্যাণ্ট সাহেব নই, বেটা শুয়োর।

আমরা মুক্তিযোদ্ধা। তোমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি, বুঝলে আহাম্মক।

টয়ের অটোমেটিক পিস্তল একেবারে বা-ফির বুকের ওপর রাখল। লোকটা ভীত ভঙ্গিতে চীৎকার করে—না না, থামুন। থামুন। এ আবার কি রকম ঠাট্টা? থামুন স্যার।

—ঠাট্টা? ঠাট্টা নয়- !

নাগান ওর হাতদুটি বেঁধে ফেলে কোনরকমে আড়ম্বর না করে। ট্রং সোজাসুজি স্ত্রীলোকটাকে রান্না ঘর থেকে ঠেলে নিয়ে এল। অবস্থাটা বুঝে দুজনেই ভয়ে শাদা হয়ে গেছে। যদিও বা-ফি এক বিন্দুও মদ্য স্পর্শ করেনি তবু ওর চোখ দুটি টক্‌টকে লাল। হাত কাঁপছে। আর স্ত্রীলোকটি ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি স্থির।

ছয়

গেরিলারা গুহার ভিতর প্রবেশ করার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে শত্রুদল গ্রামের ভিতর ছড়িয়ে পড়ল।

পাহাড়ের দিক থেকে কাঁঠাল গাছের পাতার আড়ালে আত্মগোপন করে হাই থেপ আর তার সঙ্গীরা শত্রু দলের প্রতিটি গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখে। কাঁঠাল, গাব গাছ প্রভৃতির ভিতর থেকে ওদের ঝাঁক স্পষ্ট দেখা যায়। ওরা নারকেল গাছে উঠছে, একজন অপরকে চীৎকার করে প্রশ্ন করছে। প্রতিদিন প্রভাতের মত সূর্য এখনও গাছের পাতায় সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে, তবে গ্রামে হট্টগোল প্রচণ্ড। নানারকমের হৈ চৈ, বন্দুকের আওয়াজ, মুরগীর উন্মত্ত চীৎকার, আর গরুর হাম্বারব এক বিচিত্র ঐকতান সুরু করেছে।

রেনজাররা বিশ্রাম করছে। কেউ কেউ নারকেল গাছের তলায় পড়ে আছে। কামুফ্লাজকরা ইউনিফর্মের জন্য ওদের আকৃতি ঝোপ-

জঙ্গলের সঙ্গে মিশে গেছে। মাঝে মাঝে নড়া-চড়া না করলে গুহার ভিতর থেকে ভিয়েতকঙের বীর বাহিনী ঠিক বুঝতে পারছে না।

একটি দল সন্ত চুরি করা রান্নার সামগ্রী নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। আর এক দল, প্রায় একটি পুরো বাহিনী, পাহাড়ের পাদদেশে প্রবাহিত নদীর দিকে চলেছে। এই নদীর নাম ইল নদী। এর কারণ এক জোড়া প্রকাণ্ড শাদা ইল মৎস্য স্মরণাতীত কাল থেকে এই নদীতে বিচরণ করে। আর কেউ তাদের ধরতে সাহস করে না। লোকে বলে এক বৃদ্ধ জেলে, তার নাম ছিল সুওন, সে ওদের লক্ষ্য করে সুতো ফেলেছিল। তারপর সব বঁড়শি হাওয়া হয়ে গেল, আর এই অপচেষ্টার অপরাধে তাকে কয়েক মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হল।

কেউ জানে না বৃদ্ধ সুওনের কাহিনী সত্য কিনা—তবে ইল মাছ সত্যি আছে। আর জল বেশ পরিষ্কার এবং মধুর। এই নদীর জল অঞ্চলটিকে এক মধুর সজীবত্বে সঞ্জীবিত রেখেছে।

সেনাদল ছাউনি তৈরী করে ফেলল, নদীর ধারে গোটা চারেক বড় বড় তাঁবু বানালো। হাই থেপ একটু উদ্বেগের স্বরে নাগানকে বলে—ভাবখানা যেন এখানে ওরা পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করে ফেলছে—এখন আবার নদীটা আটক করছে।

নাগান চুপে চুপে বলে—তাই তো মনে হচ্ছে।—যাক্ ওতে আমাদেরই কাজ কমবে।

– আমাদের গুহায় কি টাটকা জল আছে?

– আছে, তবে তেমন নয়। এই অবস্থা যদি দু'তিনদিন চলে তাহলে অবস্থা গুরুতর হবে।

হাই থেপের চোখ নীচের দিকে নিবদ্ধ। সে বলল, বেশ, চল যাই গুহায় যাই। অবস্থাটা ওদের জানানো প্রয়োজন।

দাৎ-কে প্রহরায় রেখে বাকী সবাই গুহায় চলল। দাৎ-কে সতর্ক করে দেওয়া হল, একটু কিছু নজরে পড়লে তৎক্ষণাৎ যেন সংবাদ পাঠায়।

এই নির্দেশ দিয়ে পাহাড়ের পথ ধরে ওরা গুহায় চলল।

পাহাড়টার পাদদেশ প্রায় চার কিলোমিটার জায়গা নিয়ে জুড়ে আছে। যেন হাজার মিটার আর সাত শ মিটার চওড়া এক বিরাট কূর্মপৃষ্ঠ। এর নিচে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বিরাট গুহা। তার একমাত্র প্রবেশপথ উৎরাই-এর দিকে, একটি মাত্র তার মুখ। এর ভিতর কয়েকটি প্রকোষ্ঠ আছে। সেই প্রকোষ্ঠ থেকে অন্যগুলি একেবারে দেখা যায় না।

হাই থেপ, বা রেন এবং নাগান প্রবেশ পথে পৌঁছাতে গেরিলা বাহিনীর তুজন রক্ষীর সঙ্গে দেখা হল। তাদের মধ্যে একজন বলল—কমরেডরা সবাই বড় কামরায় আছেন।

নাগান প্রশ্ন করে—আচ্ছা এখানে দাঁড়িয়ে বাইরে কি হচ্ছে বেশ দেখতে পাও?

- নিশ্চয়ই।

—বেশ একটু দেখা যাক' এই বলে নাগান গেরিলার জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখতে পেল নীচে কি হচ্ছে। শত্রুদল নারকেল গাছগুলির তলায় ছাউনি গড়ার কাজে ব্যস্ত।

সে বলে ওঠে—চমৎকার। পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে চমৎকার।

এর পর নাগান হাই থেপ আর বা রেনের সঙ্গে ভিতরে যায়। বাঁ-দিকে মোড় নিয়ে ঘোরানো গলিপথ ঘুরে বড় ঘরটায় পৌঁছাতে বেশ কয়েক মিনিট সময় লাগল। এখানে একটি মাত্র ম্লান আলো আর অনেক মানুষের কণ্ঠস্বর। গেরিলা বাহিনীর সবাই প্রায় এইখানে। এ ছাড়া যে সব নেতৃবৃন্দ শত্রুদের কাছে পরিচিত এবং বাইরে পরিবারবর্গের সঙ্গে থাকা তাঁদের পক্ষে নিরাপদ নয়। কেননা ধরা পড়ে যাবেন। তাই তাঁরাও এইখানে আছেন।

কিছু দিন আগে এক সংঘর্ষে আহত হয়েছে বী, সে একটি মাতুরে শুয়ে আছে। তার পাশে বসে তার প্রিয়তমা নামনো ওকে ধীরে ধীরে হাওয়া করছে। ওর হাতটি একটি মোড়া রুমালে ঝুলছে।

থাম বলে ওঠে—কে নাগান নাকি ?

—হ্যাঁ, আমি, কি খবরটবর সব ?

যতদূর ভাল হতে হয়।

—আচ্ছা সেই ছোট দলটা এখনও ওখানে নাকি ?

--আমার তো তা মনে হয় না। নাম নো কথার ভিতর বলে ওঠে। ওরা নিশ্চয়ই এতদিনে চলে গেছে।

—সম্ভবত।

নাগান কোমর থেকে টর্চটা টেনে নিয়ে বন্ধুর পায়ের আঘাত পরীক্ষা করে। ছোট্ট থুয়া কাছে এসে দাঁড়ায়। ভয়ে ভয়ে সেও দেখার চেষ্টা করে। থাম ওর হাতটি ধরে বলে, বস আমার পাশে।

আঘাতটা বেশ যত্ন নিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা হয়েছে। রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। নাগান ঝুঁকে পড়তে শুনতে পেল, থাম বলছে—এই আঘাতটা তেমন কিছু জোর নয়। পায়ে সামান্য মরটারের টুক্‌রো লেগেছে। তুমি বরং বীকে একটু বেশী করে দেখ। ওর হাতটা একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। তবে ছোকরা বেশ শক্ত, এতটুকুও গোঙানি শোনা যায় নি।

নাগান বী-র কাছে গিয়ে টর্চটা জ্বাললো। ছোকরার জামার হাতটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। তার ভিতর দিয়ে ওর কাঁধ পর্যন্ত ড্রেসিং দেখা যাচ্ছে। ব্যাণ্ডেজ শুকনো রক্তের কালো কালো ছাপ দেখা যাচ্ছে। বী-র যে হাতটা অক্ষত আছে সেই হাতটি মাদুরে পড়ে আছে, সে প্রাণপণে মাদুরটা সেই হাতে আঁকড়ে আছে। ওর আকৃতি কিঞ্চিৎ পাণ্ডুর, কিন্তু ওর ঠোঁট দুটি একেবারে তাজা। সর্বদাই যেন ঘুমিয়ে আছে। ওর মুখ দেখে যন্ত্রণার গভীরতা অনুমান করা যাবে না। নাগানের অতীতের কথা মনে পড়ে, একটুতেই কেমন হেসে উঠত বী। ছোট ভাই উট যখন লাফাত, কিংবা যখন প্রচুর মাছ জালে ধরতো তখন ওর কি আনন্দ !

নাগান যেন দেখতে পায় শত্রু তার গোলা-কামান নিয়ে এগিয়ে চলেছে। উত্তেজনায় তার রক্ত টগবগ করে ফোটে।

এইসব ভেবে উৎপীড়িত হচ্ছে এমন সময় হাই থেপ ওকে ডাকল। কোয়েন বী-র কাপড়-চোপড় ঠিক করছিল, তাকে বলল—চল আমাদের ডাকছে, এখন আবার মিটিং আছে।

কোয়েন থুয়ার দিকে তাকায়। সে নিস্পন্দের মত পড়ে বিশ্রাম করছে, থামের কাঁধে তার মাথাটা। কোয়েন তাকে প্রশ্ন করে—তুমি কি নাম নো মাসীর কাছে লক্ষ্মীটি হয়ে থাকবে ?

—হুঁউ, থাকব তো।

এই মিটিং-এ শুধু পার্টি মেম্বারদের ডাকা হয়েছে।

সবাই যে যার জায়গায় বসে পড়ল। তখন হাই থেপ বলে আমি প্রথমটায় ভেবেছিলাম পার্টি মেম্বারদের আলাদা আলাদা ডাকব। তারপর ভাল করে ভেবে বুঝলাম তার দরকার নেই। আমরা সকলকেই ডাকব, শুধু যারা পাহারা দিচ্ছে, আর যারা আহতদের দেখাশোনা করছে তারা বাদ। কমরেড, তোমরা কি বল !

আমরা একমত।

বা রেন বাদ বাকী সবাইকে ডাকতে যায়।

সবাই আসতেই হাই থেপ শুরু করে—আমি তোমাদের যা বলব তা তোমরা যে জান না তা নয়। এইবার শত্রুপক্ষ সবচেয়ে বড় আক্রমণ চালাবে। এত বড় আক্রমণ এই অঞ্চল আগে আর দেখেনি। ভ্যান থানায় আমাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার পর এইবার সংঘর্ষটা এসেছে একেবারে আমাদের গ্রামের বুকে। একটু আগে এখান থেকে ওদের ভাল করে দেখে আমি বুঝেছি যে, এই যাত্রায় ওরা আমাদের এই গুহা ঘেরাও করবে। জল ওদের অধিকারে, আর গ্রাম থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন। আমাদের চরদের কাছ থেকে সমুদ্রতীর থেকে যে গুপ্ত ইঙ্গিত পেয়েছি তাতে জেনেছি এখান থেকে

মাত্র এক কিলোমিটার দূরে দশটি 'এল এস এম' এসে নেমেছে। ওরা আমাদের আঘাত হানবে। আমাদের একটা উপায় ভেবে নিতে হবে, কিভাবে আক্রমণ ঠেকানো হবে তা স্থির করতে হবে…।

ইতিমধ্যে বিস্ফোরণের আওয়াজে কথায় ছেদ পড়ল। কিছু মাটি আর পাথর গুহার মেঝেতে পড়ল। সবাই লাফিয়ে উঠল, স্প্রিং-এর দোলা খেয়ে যেমন পুতুল লাফায়। এ আবার কি…। আবার বিস্ফোরণ, যেসব পাথব কিছু ঢিল-ঢালা সেগুলি খসে পড়তে থাকে।

নাগান বলল --এ নিশ্চয়ই ৮১ মিলি মিটারের মরটার সেল পাহাড়ের ওপর ফেলছে।

তাই মনে হচ্ছে।

বা রেন বলে—থুঃ। এক হাজার কিলো ওজনের বোমা আমাদের কি করবে।

প্রায় দশ মিনিট ধরে বিনা বাধায় বিস্ফোরণ চলতে থাকে। তার প্রতিধ্বনি গুহার অভ্যন্তরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। সবচেয়ে মুশকিল, শত্রু পক্ষ ঠিক কি করছে না বুঝলে কিছু করা যায় না। মনে হয় ভারী কামান দিয়ে পাহাড়টা ওড়াবার চেষ্টা করছে। দাং ঘরের ভিতর দৌড়ে এসে বলে।

সে বলে —অধিকাংশ গাছ উড়িয়ে দিয়েছে। একটা পাহাড়ের মাথা থেকে আমি ওদের পদধ্বনি শুনেছি।

হাই থেপ জানতে চায়—আর গ্রামের লোকজন কি করছে?

পাহাড় থেকে একশ মিটার দূরে সবাই আছে।

—আর প্রবেশপথে?

-এখনও নয়।

হাই থেপ বলে—একটা গোলন্দাজ বাহিনী চাই। আর আমি বলি কি, তিনজন করে লোক নিয়ে চারটি দল তৈরী করে নাও। তুজন থাক গুহার প্রবেশদ্বারে, আরও তুটি দল একটু ভিতর দিকে। ওবা সমস্ত টমসন পিস্তল আর হ্যাণ্ড গ্রেনেড হাতে রাখবে। বা রেন

আর নাগানের দল এখনই যাও। বাকীরা অপেক্ষা করো।

বা রেন আর নাগান কাজে লেগে যায়। ত্বদল গেরিলা আর সশস্ত্র প্রচার বাহিনীর ছুটি দল নির্বাচিত হল।

প্রবেশদ্বারের দিকে যেতে যেতে নাগান দেখল বা রেন তার বড় ছুরি হাতে বেরিয়ে পড়েছে। সে বলল—ঠিক কোণ নিয়ে দাঁড়াও, আমরা সদরে থাকছি।

—বেশ, তবে শোনো অবস্থা একটু বেশী গরম বুঝলে পিছিয়ে আসতে ইতস্তত করবে না, আমরা গিয়ে হাজির হব।

-- আচ্ছা, তাই হবে।

সবাই যখন বেশ গুছিয়ে যে বার জায়গায় দাঁড়িয়েছে তখন দেখা গেল দাং দৌড়ে আসছে, তার মুখে খুশির আমেজ—শুনুন। গেগ আমাকে আপনাদের সঙ্গে কাজ কবার অনুমতি দিয়েছেন।

নাগান একথা শুনে বলে--উত্তম. তাহলে আমাব কাছেই থাকো। তোমার রাইফেলের কটা বুলেট আছে?

—পঁয়তাল্লিশটা।

আমার বোধ হয়, তুমি তো এবিষয়ে একেবারে ওস্তাদ।

লজ্জিত ভঙ্গিতে দাং হাসে, বলে—কোনোরকমে চালাই এই পর্যন্ত। আপনাদের মত কি আর!

—আমি কোনোরকমে ম্যাস চালাতে পারি। কারবাইনে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

—আপনি ম্যাস বন্দুকে কাজ চালাতে পারলে কারবাইনেও চমৎকার পারবেন। অনেক সহজ হবে কাজ করার পক্ষে। তা ছাড়া কেউ যদি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে সে ঠিক লক্ষ্যভেদ করতে পারবে, যে কোনো বন্দুকেই পারবে।

নাগান দাং-এর গ্রাম্য আকৃতির দিকে তাকায়। তারপর হেসে বলে, তুমি কি সর্বদাই ঠাণ্ডা থাকতে পারো?

—নিশ্চয়ই।

স্পষ্ট উত্তর। নাগান বোঝে ও সত্যি কথাই বলছে।

এই আঠারো বছর বয়সের ছেলেটিকে অনেক দিন ধরেই ও পছন্দ করে। নাগান যখনই তাম চেনকে দেখতে এসেছে তখনই লক্ষ্য করেছে তার নেতাদের সে কি শ্রদ্ধা করে, কি তোয়াজে রাখে। গার্ডের ডিউটি ছাড়া, রান্না-বান্নাটাও যাতে একটু ভালো হয় সেদিকেও ওর নজর। নাগান এইভাবে ওর হাতে মাছের তরকারি, পাখির রোস্ট এইসব খেয়েছে। ছেলেটা অনাথ—এই সংবাদেই নাগান তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। ওর নিজের মাও ওকে জন্ম দিয়েই মারা গেছেন। প্রথম প্রতিরোধের কালে দাং-এর মা গ্রামের দলে ছিলেন, এবং ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে নিহত হন দিয়েমের দালালদের হাতে। ওরা তাঁর দেহটা জলায় ফেলে দিয়েছিল। কোয়েন আর সু তাঁর এবং আরো অনেকের হাড় নিয়ে গুহায় রেখে দিয়েছে। দাং-এর এখন শুধু এক দিদিমা আছে, প্রায় ষাট বছর বয়স, তিনিই লিন কোয়ায় থাকেন।

নাগান দাং-কে বলে—একটা জায়গা বেছে নাও, যেখানে বেশ সহজে চলাফেরা করতে পারবে!

ও, আমার ঠিক হয়ে যাবে। নিজের বন্দুকটা একটা পাথরের ওপর রাখল, তার লক্ষ্য রইল প্রবেশপথে। একটা চোখ বুজিয়ে লক্ষ্যটা ঠিক করে নেয়। এই রকম বার কয়েক করে তার পর নিজের মদের পাত্রটা খুলে কয়েকবার মদ্যপান করল, তারপর নাগানকে বলল একটু নেবেন নাকি?

নাগান বলল—আমার সঙ্গে সবই আছে। এই বলে নিজের কোমরবন্ধে বাঁধা পাত্রটির দিকে দেখায়। একটু পরে নাগান বলে—দেখো দাং, মদটা যত কম সম্ভব খাবে, বেশী খাবে না। যখন অসহ্য মনে হবে তখনই খাবে।

তারপর নাগান আর সবাইকে সম্বোধন করে বলে—তোমাদের

জল যতটা কম খরচ করতে পারো তাই করবে। শুখনো ভাত তোমাদের প্রধান খাদ্য, কিছু ভালো লাগছে না বলে যেন তাই চিবিয়ে নষ্ট কোরো না।

ট্রয় বলল—কিন্তু গুহার ভিতর তো শাদা ভাত আছে।

--হাঁ, তবে তা পরিমাণে অনেক কম। বড় জোর তিন কি চার দিন চলতে পারে।

—ততদিন ওরা চলে যাবে।

—কিছুই ঠিক করে বলা যায় না। যদি আমাদের ঘেরাও করে থাকে এক সপ্তাহ ধরে? তখন কি হবে?

কেউ উত্তর দেয় না। সবাই এক-একটি জায়গা বেছে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

কোয়েনের হাতের টর্চলাইটে সু সমস্ত জালাগুলি পরীক্ষা করছিল। তাকে প্রতিটি জালায় হাত বুলিয়ে দেখতে দেখে কোয়েন প্রশ্ন করে—একটু-আধটু চুঁইয়ে পড়ছে না তো?

সামান্যই। এইখানে থাকো। আমি একটা প্লাস্টিক শীট যোগাড় করে আনি, তাই দিয়ে জালাগুলি মুড়ে দিলে আর জল নষ্ট হবে না।

যখন ফিরে এল তখন সু-র হাতে একটা প্রকাণ্ড প্লাস্টিকের টুকরো। চেনকে সে বলল প্লাস্টিক খুলতে খুলতে--আলো দাও একটু।

তারপর ভালো করে দেখে বলে—ভালোই হল, কোনো ছেঁদা নেই।

মেঝের সবচেয়ে মসৃণ অংশে সেটা ছড়িয়ে একে একে জালাগুলি তার ওপর রাখল। সে বলল, ভারী বিশ্রী কাণ্ড। নাম নো আবার একটা ভেঙে ফেলেছে।

তারপর প্লাস্টিকের কোণগুলি বেঁধে দিয়ে বলে—বেশ চলো এইবার চালের জালাগুলি দেখে আসি।

দুই বোন দুটি পাশাপাশি সুড়ঙ্গ ধরে চলল—সহসা ডান দিকে ওরা শুনল সেই ভেড়ীওলার নিঃশ্বাস, যেন হাঁপাচ্ছে। ওদের পদধ্বনি শুনে ভেড়ীওলার স্ত্রী বলে—দয়া করে একটু জল দিন!

কোয়েন বোনের হাতটা টিপে বলে জল চাইছে, শুনছিস!

—এখন অপেক্ষায় থাকুক। আমি হাই থেপকে আগে জিজ্ঞেস করি। কোয়েন গলার স্বর চড়িয়ে বলে—জল চাই। একটু অপেক্ষা করো।

স্ত্রীলোকটি চীৎকার করে বলে—কে মা কোয়েন? দয়া করো মা। আমাদের জন্য একটু ব্যবস্থা করো মা! দয়া করো।

কোয়েন এটা আশা করেনি। তাকে ওরা চিনে ফেলেছে।

সে বলে—অমন ভিখিরীপনা করতে হবে না। আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারব না। তোমাদের বিচার হবে জনগণের আদালতে, তখন যা বলার বল।

স্ত্রীলোকটি আতঙ্কে চীৎকার করে বলে -পিপলস্ কোর্ট। গণ আদালত? হা ভগবান আমাদের সর্বনাশ হল!—সে কাঁদতে থাকে।

তার স্বামী চেঁচায়—চুপ কর। আমি তোমাকে চুপ করে থাকতে বলেছি না?

কোয়েন ভাবে, তোমরা শয়তান এইবার তোমাদের দেখে নেব আমরা।

ভাতের পাত্রের কাছে পৌঁছে এক মুঠো হাতে তুলে গন্ধ শুঁকে সু বলে ওঠে—বাঃ মৎকার আছে।

দুটি জালায় আলো ফেলে কোয়েন বলে—দুটি জালায় প্রায় একশো কিলো মাল আছে!

সু চিন্তামগ্ন। সে বলে—অতটা বোধ হয় নেই। কিন্তু কিভাবে রান্না করব? জল ব্যবহার করা যাবে না!

—সত্যি তো। কি হবে ভাই…?

- আজকের জন্য, সবায়ের পকেটে যার যা রেশন তা আছে। কাল কোনো রকমে খিচুড়ি গোছ বানিয়ে দেব। কি বলিস!

—তাই হবে, তাছাড়া আর কি করা যাবে!

ওরা গিয়ে হাই থেপকে অবস্থাটা জানায়। হাই থেপ হেসে বলে—আমরা তোমাদের দুজনের ওপর ভরসা করে আছি। কম থাকে রেশন কম দেবে, বেশী থাকে বেশী করে দেবে—তবে যারা আহত তাদের দাবী সর্বাগ্রে মেটাতে ভুল না।

সু আর কোয়েন গুহার ভিতর একটি উনুন বানানোর জন্য পাথর খুঁজতে গেল।

এমন সময় মেসিন গানের একটি প্রলম্বিত আওয়াজ শোনা গেল।

কোয়েন বলে—ওরা আক্রমণ শুরু করেছে।

- আচ্ছা আমাদের কোনো জবাব নেই কেন?

ঠিক এই সময় টমসন বন্দুকের তীব্র আওয়াজ শোনা গেল। সেই সঙ্গে হালকা বন্দুক আর কারবাইনের আওয়াজ।

কোয়েন চীৎকার করে বলে, এই আমাদের পাল্টা জবাব। এই কথা বলে বোনের ডাক উপেক্ষা করে কোয়েন ছুটল সদর প্রবেশ পথে যেখানে হাই থেপের দল রয়েছে সেইখানে।

হাই থেপ বলছে শোনা গেল—আমরা আরও একটা দল গড়েছি। আমার সঙ্গে কে কে আসতে চাও?

—আমি!

—আমি!

কোয়েন হাত তুলে এগিয়ে এল, কিন্তু পার্টি সেক্রেটারি তাকে ঠেলে দিলেন। কোয়েনের মনে বড় দুঃখ হল।

দুটি গেরিলা হাই থেপকে অনুসরণ করে। তু নাঘিয়েপ তার বগলের তলায় 'প্রেইং ম্যানটিস' নামক মবটার নিয়ে এগিয়ে এসে বলে—আমার অস্ত্রে কি রকম কাজ করে দেখা যাক, কেমন?

—আরেকটি কোথায়?

—ওখানে আছে।

—দুটোই নিয়ে চল।

একটু দূরে গুহার প্রবেশপথে ওরা শুনতে পেল বা রেন বলছে—ভিতরে সবাই বেশ শান্ত হয়ে অপেক্ষা করাই ভাল। এখনও ঠিক তোমাদের পালা আসেনি। এমন কি এখানে আমাদের অস্ত্র গুটিয়ে রাখতে হয়েছে। যে সব বেজন্মা এদিকে এগিয়ে এসেছিল নাগান ও তার অনুচরবৃন্দ তাদের ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। যদি দেখতে চাও এদিকে এস, একেবারে দোরগোড়ায় ডাঁই হয়ে পড়ে আছে।

—কোথায়? কোথায়?

সবাই এগিয়ে গেল দেখতে। হাই থেপ পাহাড়ের ভিতর থেকেই একটি গর্তের থেকে দেখতে থাকে। শত্রু দলের ছ'জন পড়ে আছে অনড় হয়ে। সবাই চিৎ হয়ে পড়ে আছে। পিঠের দিকে যার যার বন্দুক। এখনও শত্রুদল গুলি ছুঁড়ছে প্রবেশপথ লক্ষ্য করে।

নারকেল গাছের ভিতর দিয়ে সূর্যালোক এসে পড়ছে। বুলেট বাঁশীর মত শব্দ করে ছুটছে। মৃতদেহের ওপর এসে বুলেট ঝরে পড়ছে। মরেও নিষ্কৃতি নেই, নিজেদের লোকের গুলির আঘাতে তাদের মৃতদেহকে জর্জরিত হতে হচ্ছে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে শত্রু পক্ষ এখনও গুলি ছুঁড়ছে পাছে মৃত সৈনিকগুলি এদের হাতে পড়ে এই চিন্তায়।

হাই থেপ সহিষ্ণু ভঙ্গিতে অপেক্ষা করে। গুলি ছোঁড়ার কাজ বন্ধ হোক তারপর দেখা যাবে। উপস্থিত করার কিছু নেই, বড় বেশী গুলি করছে।

এক মিনিট পরে অসহিষ্ণুতায় আকুল হয়ে হাই থেপ বলে—ঐ সব অস্ত্রগুলো কুড়িয়ে আনার জন্য একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

বা রেন মাথা নাড়ে।

দুজনে নাগানের দলের দিকে এগিয়ে যায়। বুলেট এসে পাহাড়ের গায়ে লাগছে। নাগানের কাছে পৌঁছে হাই থেপ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে—এই গুলির মুখে দাঁড়ানোর উপায় নেই না?

নাগান মাথা নাড়ে, তার মুখে চিন্তার ছাপ। দাৎ তার পায়ের কাছে বসে কেবল অনুনয় করছে—আমি গুঁড়ি মেরে যাই। আমি তো ছোট আছি—আমার গায়ে আঁচ লাগবে না—অনুমতি দিন। কেমন। যাবো?

এ্যাঁ, যাবো?

নাগান কথা না বলে ভ্রূ কুঞ্চিত করে। দাৎ মনে করে নীরবতাই অনুমতি। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে যাবার উদ্যোগ করতেই নাগান বলে ওঠে--আমি অনুমতি দিইনি দাৎ। ওখান থেকে এক পাও নড়বে না, বুঝলে।

দাৎ-এর মুখ ম্লান হয়ে গেল। কান্নায় ভেঙে পড়ার ভয়ে সে ঠোঁটটা দাঁতে চাপে। সে বলে—বেশ, তাই হোক। তবে দেখবেন ঐ সব অস্ত্রশস্ত্র ওরা নিজেরাই উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

একটা দৃঢ় কণ্ঠস্বর শোনা গেল--আমি যাচ্ছি। এ কণ্ঠস্বর নাঘিয়েপের। চল্লিশ বছর বয়সের এই গেরিলা অনুমতির অপেক্ষা রাখে না। সে তার জামা আর প্যাণ্ট খুলে ফেলল। শুধু ভিতরকার প্যাণ্টটা পরা রইল। তার ভাবগতিক দেখে বোঝা গেল সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তার সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত। সে বলে—আমাকে একটা শক্ত দড়ি দাও দয়া করে।

--কেন, কি হবে?

—বন্দুকগুলি বেঁধে নেব। তারপর তোমরা সেটি উঠিয়ে নেবে। যেমন কুয়া থেকে জল তোলে।

নাগান মাথা নাড়ে, সে বলে—খুড়ো এখনই যেও না। ওরা যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে, আমার মনে হয়—

নাঘিয়েপ অসন্তোষ চাপতে পারে না, বলে—যদি আসে। ওরা ওদের অস্ত্র নিয়ে যাবে, আর আমরা আগের মত ভিক্ষে করব!

নাগান বলে—তা নয়, ওরা এলে গেলবারের মতই আমরা অভ্যর্থনা করব। কিছু নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেব না। আর তার ঠিক পরেই আমরা নেমে গিয়ে সব লুঠ করে নিয়ে আসব। টয় ট্রং এবং আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো ছাতার মত, কেমন?

হাই থেপ মাথা নাড়লেন। সবাই স্বীকার করল, সেই উত্তম ব্যবস্থা হবে।

নাগান বলে—আমাদের সর্বপ্রথম এগিয়ে যেতে হবে। উপস্থিত তোমরা অসহিষ্ণু হয়ো না। বিশ্রাম নাও, ওরা প্রাণভরে গুলি ছুঁড়ে যাক—কেমন?

সবাই বলে ওঠে বেশ তাই হোক।

এই তড়িৎগতির পরিকল্পনা কানে যেতে দাং-এর মনের ভার অনেকখানি কেটে গেল। তু নাঘিয়েপ বলে –ফন্দিটা ভালোই, তবে আমাদের একটু দ্রুতগতিতে কাজ করতে হবে।

শত্রুর পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য সবাই অপেক্ষা করে। নাগানের মতলবটা বেশ সাহসিক এবং সুনিশ্চিত, সবাই তাই খুশি হল। গুহার ওপর বুলেট বর্ষণ অবিরাম বেগে চলতে থাকে।

বছরখানেক সিয়াটোর একটা আক্রমণের পর সমুদ্রতীরে একটা প্যারাস্যুটের অংশ বিশেষ কুড়িয়ে পেয়েছিল নাগান। সেই প্যারাসুটের কাপড় দিয়ে কোয়েন একটা সুন্দর সিগারেটের তামাক রাখার পাউচ বা থলি বানিয়ে দিয়েছিল। নাগান সেটি বার করল। নাগান এই উপহারটি পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল -ওয়ানডারফুল! অপূর্ব।

কোয়েন বলেছিল—এটা শুধু সেই ধূমপায়ীর জন্য করুণাবশতঃ

তৈরী করা হয়েছে, যার কোনো পাত্র নেই তামাক রাখার। কিন্তু ধূমপানে উৎসাহদানের উদ্দেশ্য নয় মশাই।

যতবার এটি বার করে ততবারই কোয়েনের এই উপদেশটা মনে পড়ে।

নারকেল গাছের ভিতর দিয়ে স্টীল হেলমেটধারীদের ঘোরাফেরা করতে দেখে নাগান তাড়াতাড়ি মুখের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বলে ওঠে এই যে এসে গেল দেখছি।

তৎক্ষণাৎ সবাই সচেতন হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঠোঁট কামড়ে শক্ত হয়ে।

আমার কথা ভালো করে শোনো সবাই। নাগান বলে ওদের তাড়িয়ে দেওয়ার পর টয় ট্রং আর আমি প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়ব তোমরা সবাই ঠিক পরেই আসবে পিছন পিছন। একটুও দেরী করবে না। বুঝলে?

কথা বলার সময় নাগান তার চোখ রেখেছে শত্রুর অগ্রগমনের দিকে। ওরা সব রকমের অস্ত্রই ব্যবহার করছে। প্রায় দুটি প্লেটুন এই আক্রমণ চালিয়েছে। ওদের পুরোভাগে আছে বেনজারস দল। নাগান একজনকে দেখতে পায়, বুক থেকে কোমর পর্যন্ত নগ্ন, সঙ্গে অজস্র তাগা তাবিজ, গলার কাছে কি একটা চক চক করছে।

বা বেন চেঁচিয়ে ওঠে এ যে স্যাম দেখছি।

হাঁ, স্যামই বটে।

সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়ে নাগান বলে—হ্যা স্যামই বটে। স্যাম থমকে থেমে গেল ট্রাকের ওপর। ওর ডান কাঁধটা খসে পড়ছে, ওরা প্রায় গুহা থেকে দশ মিটার দূরে আছে। ওদের দুজন লোক ওকে পিছন দিকে নিয়ে যায়। টয় ট্রং আর দাৎ সমানে গুলি চালাচ্ছে। গেরিলার বুলেটের আঘাতে শত্রুরা চীৎকার করে একে একে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। নাগান আর একবার নতুন আঘাত হানে।

কয়েকজন গুহা মুখে লুটিয়ে পড়ল—বাকী সবাই এগিয়ে আসার চেষ্টা করে। টয় একটি বৃহৎ "এম কে ৩" গ্রেনেডে পিনটা টেনে দেয়। তিন গুনে সেই অস্ত্র এক ঝাঁক শত্রুসেনার মধ্যে ফেলে দেয়। এই বিস্ফোরণের ফলে প্রবেশপথ অন্ধকার হয়ে গেল।

নাগান বলে চীৎকার করে আরেকটা

দ্বিতীয়টা ছুঁড়ল ট্রং। একেবারে ওদের মাঝখানে গিয়ে পড়ে। ওরা ওঠার চেষ্টা করছিল ঠিক সেই সময়। এর ফলে ওদের আক্রমণে ভাঁটা পড়ল। এবার পিছু হঠছে। নাগান দেখল সেনাদল স্যামকে পালাবার সময় কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। সে একটা গুলি ছুঁড়ল। ওরা দৌড়চ্ছে। দ্রুতপায়ে আরেকটি গুলি ছুঁড়ে, নাগান চেঁচায় - অ্যাটাক আঘাত হানো!

নাগান গুহা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তার পদাঙ্কানুসরণ করল টয় আর ট্রং। বা রেন হাই থেপ আর সবাই ওদের পিছে পিছে এল শত্রুদের দেহ থেকে বারুদ, বুলেট ইত্যাদি সংগ্রহ করতে। তু নাঘিয়েপ এব দাং কার্টিজবেল্ট আর টমসন ক্লিপগুলি মৃতদেহ থেকে খুলতে থাকে। মাত্র দুটি বেলট আর কিছু ক্লিপ সংগ্রহ করতে না করতেই শত্রুপক্ষ আবার আঘাত হানে। এই বুলেটের শিলাবৃষ্টির মধ্যে ওরা গুঁড়ি মেরে ফেরার উপক্রম করে. বন্ধুরাও গুলি করে শত্রুর আঘাতকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। দাং প্রায় ব্যাঙের মত গুঁড়ি মেরে দুই বেলট ভর্তি কার্টিজ টেনে নিয়ে চলেছে। তু নাঘিয়েপও আরো ধীরে এবং ভালভাবে গুঁড়ি মেরে আসছে। নাগান এখন বন্দুক ছুঁড়ছে. সেদিক থেকে চোখ ফেরাচ্ছে না।

গুহা থেকে মাত্র কয়েক গজ দুরে পৌঁছাতে বাকী এমন সময় হাই থেপ চীৎকার করে —তাড়াতাড়ি চলে এসো।

অতি কষ্টে ওরা শেষে গুহায় এসে পৌঁছল। অনেক জায়গায় ছড়ে গেছে, হাঁটু দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। তু নাঘিয়েপ হাঁপাচ্ছে। সে বলছে—জানো আমরা খুব বেঁচে গেছি!

সে একটা টমসন ক্লিপ থেকে একটি বুলেট বার করে পরীক্ষা করে। একেবারে নতুন, পিতল চকচক করছে, গুলির মুখটার সামান্য বেগুনি রং। নাকের কাছে নিয়ে শুঁকে সে চেঁচিয়ে বলে— বারুদের কি সুন্দর গন্ধ! একেবারে সবে প্যাক থেকে খুলেছে! আচ্ছা কটা বন্দুক আমরা পেয়েছি?

বা রেন বলে -ছটা, পাঁচটা গ্যাবানডস আর একটা টমসন। এই বলে একটি ওর হাতে দিয়ে বলে এই নাও এটা তোমার।

—বাঃ, জীবনের একটা মানে পাওয়া গেল। কষ্ট না হলে কেষ্ট পাওয়া যায় না লোকে ঠিকই বলে। আমি যা চাই তা সবই আমার আছে। এটা আমাকে একেবারে দিলে?

—একেবারে চিরকালের জন্য। কিছু ভেবো না, আমরা আরো পাবো।

—জানো ভাই এখন আমার মরতেও দুঃখ নেই।

নাগান খুশিমনে হাসল, তারপর এক ঢেলা ভাতের গোলা বার করল। সূর্য ঢলে পড়েছে, ক্ষিধেও পেয়েছে। শত্রুর গতিবিধির ওপর নজর রেখে ওরা গতকালের ভাতের মণ্ড গোগ্রাসে খাচ্চে - এমন সময় দেখা গেল কোয়েন শুঁটকি চিংড়ি মাছ বিতরণ করছে সবাইকে। পরিবেশন শেষ হলে কোয়েন একপাশে বসে পড়ে রাইফেলগুলিতে স্নেহভরে হাত বুলোয়। তারপর নাগানের কাছে গিয়ে নিজের আবেগ চাপবার জন্য বুকের ওপর হাত চেপে বলে—আমি দেখলাম তুমি লাফিয়ে পড়লে—।

তুমি বুঝি পাহাড়ের পাশে লুকিয়ে ছিলে?

কোয়েন মাথা নাড়ল। যেন কিছুই ঘটেনি এইভাবে নাগান ভাতের মণ্ড খাচ্ছে। কোয়েন সেদিকে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ চুপ করে কণ্ঠস্বরে গভীর হতাশার সুর এনে কোয়েন বলে- আমার ওপর কারো বিশ্বাস নেই। আমাকে লড়াই করতে অনুমতি দেবে না।

—দেখো, এটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়। আমাদের এখনও তোমাকে প্রয়োজন হয়নি। প্রয়োজন হলে তোমাকে নিশ্চয়ই বাদ দেওয়া হবে না। প্রিয়তম একটু ধৈর্য ধর - ।

স্যাম ধীরে ধীরে চোখ খোলে। তার ডান কাঁধটিতে যন্ত্রণা হচ্ছে, সেই হাতটি ড্রেস করা হয়েছে। এইখানে দুটি টমসন বুলেট লেগেছে। যাই হোক ও মারা যায়নি। ধীরে ধীরে তার জ্ঞান হচ্ছে -সে নিজের তাঁবুতেই আছে। চেষ্টা করছে কি হয়েছে তা মনে করার।

যে ভিয়েতকঙ ওকে আহত করেছে --তার মুখটা যেন চেনা চেনা। তাকে একবার একটুমাত্র দেখেছে, তাহলেও চিনেছে। ঠিক কোথায় যে দেখেছে তা মনে পড়ছে না বটে। কত শত লোককে নিজের হাতে মেরেছে। কত আবার মারা সম্ভব হয়নি। সবাইকে কি মনে রাখা যায়। নিজেকে তিরস্কার করে আত্মগতভাবে স্যাম বলে ও গুলি করার আগে তোমার গুলি করাটা ঠিক হয় নি।

ক্ষীণদৃষ্টি একজন জুনিয়র অফিসব হেড নার্সের কাজ করে। স্যামের ওপর ঝুঁকে পড়ে সে বলে- -লেফটেন্যাণ্ট আপনার আঘাতটা তেমন গুরুতর নয়।

-তাই নাকি।

না, তেমন সীরিয়াস নয়। তবে সেরে উঠতে সময় লাগবে।

স্যাম, এতসব ভাবছে না। সে বুকের ওপর হাত রেখে যে হাস্যময় দেবতার তাবিজটা গলায় বাঁধা, তাতে হাত বুলোয়। যাক বাবা, বেঁচে গেছি তোমার দয়ায়। এটা না থাকলে আজ কি হত কে জানে। অনেকদিন পরে এই গ্রাম হোন দাং-এ ফিরে এল ও। আর, কি ভাগ্যের পরিহাস! এটা অপ্রত্যাশিত। আগে যখন এখানে পোষ্ট কম্যাণ্ডার ছিল তখনকার হোন দাং আর এই হোন দাং-এর মিল নেই কিছু।

কথাটা মনে পড়তে, রাগে সারা অঙ্গ জ্বলে যায়। সে মনে মনে

ভাবে আমি ব্যাটাদের মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। কাউকে বাকী রাখব না। সে হেড নার্সকে প্রশ্ন করে -ওরা কি আবার গুহায় আক্রমণ সুরু করেছে ?

—না দাদা, এখনও নয়।

-কেন। কেন করা হয়নি ?

কম্যাণ্ডারের হুকুমেব অপেক্ষা।

দাঁতের ওপর দাঁত চেপে স্যাম চীৎকার করে--থুঃ। আমাদের এক হাজার লোক রয়েছে সঙ্গে, আর আমরা গুহা আক্রমণ করতে হুকুম পাচ্ছি না। আমরা বসে বসে শুয়োরের মত মরছি। না, এসব ভাবলে পাগল হয়ে যাব।

কিন্তু বড়দা, ওদেব আত্মরক্ষার সুযোগ একটু বেশী।

স্যাম চুপ করে থাকে। হেড নার্স কথাটা ঠিকই বলছে। গুহা আক্রমণ করা সহজ নয়। তার প্রমাণ, ও নিজেই শয্যা নিতে বাধ্য হয়েছে।

নার্স বলতে থাকে একটু আগেই তো একটা হেলিকপ্টারে কয়েকজন মাকিণ উপদেষ্টা এসেছিলেন। শুনছি তাঁরা নাকি গুহা অবরোধ করতে আদেশ দিয়েছেন। তাহলেই ওরা খিদে তেষ্টায় কাতর হয়ে পালাতে পথ পাবে না। জলে বিষ মেশানোব হুকুম একটু আগেই পেলাম।

স্যাম উপুড় হয়ে শুয়ে সবিস্ময়ে বলে ওঠে -আমরা শেষে বিষ মিশিয়ে দেব জলে ?

নার্স মাথা নেড়ে বলে হ্যাঁ, সেই রকমই তো আদেশ।

স্যাম উদ্বেগভরে প্রশ্ন করে -আর আমরা কি জল খাব ? আর লোকেরা ? ওদের যদি না বলি ওরা তো সব মরবে ?

—না, তা নয়, আমরা কিছু জল সঞ্চয় করে বাঁধে রাখব, আর গুহার কাছের জলে বিষ মিশিয়ে দেব।

স্যাম আবাব চিৎ হয়ে বালিশ মাথায় শুয়ে শুয়ে নিজের মা ও

বোনের কথা ভাবে। এই মাকে আজ সকালে যখন দেখতে গিয়েছিল তখন মা তেমন কঠোর ভঙ্গীতে কথা না বলে বেশ কোমল গলায় কথা বলেছেন, বেশ শান্তভাবে।

এই মার প্রতি শ্যাম চিরদিন দুর্ব্যবহার করে এসেছে। ওর জন্যই মা অর্ধ-উন্মাদিনী। গ্রামের লোকজনের ওপর শ্যামের অত্যাচার মা সহ্য করতে পারেন নি।

আজ মার শান্ত মিষ্টি কথা ওর মনের গ্লানি দূর করে দিয়েছে।

এখানকার চেয়ে মার কাছে গিয়ে যদি থাকে তাহলে হয়তো তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে! এইখানে তাঁবুতে পড়ে আধ-ভাজা হওয়ার কি দরকার?

শ্যাম বলে —আমি আমার মার কাছে গিয়ে থাকতে চাই।

হেড নার্স বলে—তা হয় না বড়দা! আপনার যা অবস্থা তাতে সর্বদা নজর রাখা দরকার। ড্রেসিং বার বার বদলাতে হবে। আপনার ঘা শুকিয়ে গেলে যেতে পারেন।

—ক দিনেই সেরে উঠব, কি বল?

—নিশ্চয়ই। কয়েক দিনের মধ্যে সেরে উঠবেন।

শ্যাম আর কথা বলে না। সে চুপচাপ পড়ে থাকে। ওর চারপাশে কোলাহল চলেছে। সেনাদল এখন খাচ্ছে।

গুহার কাছে দুটো অবরোধ বসানো হয়েছে মালার মত, একটা একেবারে কাছে, আর একটা একটু দূরে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে এল, নতুন সংঘর্ষ ঘটছে না। সকালের মত তেমন গুরুতর গুলি ছোঁড়া-ছুঁড়ি হয়নি। এখন মাঝে মাঝে দুটি একটি গুলির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

সেনারা যে সব গরু মোষ মাঠে চরছে তাদের ওপর গুলি চালাচ্ছে। গুলি গায়ে লাগলে সেই সব আহত পশু করুণভাবে চীৎকার করছে, আর সমগ্র পল্লী অঞ্চল মুখরিত হয়ে উঠছে।

সূর্যালোক গাছের পাতায় ম্লান হয়ে আসছে। সমুদ্রের হাওয়া

ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠছে। সপ্ত পাহাড়ের কালো পশ্চাদপটের পিছনে পাখিদের শাদা ডানা দেখা যাচ্ছে।

প্রতি সন্ধ্যায় এইরকম সময় সারাদিন অন্যত্র অন্নের সন্ধানে উড়ে বেড়িয়ে পাখিগুলি হোন দাৎ-এ ফিরে আসে। এখানে আম গাছের পাতার আড়ালে ওরা আশ্রয় নেয়, সেখানেই নীড় বাঁধে।

আজকের সন্ধ্যায় প্রথম পাখিটি গাছের ডালে বসেই তৎক্ষণাৎ চীৎকার করে আবার উড়ে যায়। সেনাদল নীচে থেকে ওদের ওপর গুলি চালিয়েছে। কয়েকটা মরে পড়ে গেল মাটিতে। বাকীগুলি বিভ্রান্তের মত কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করে হোন সি-র দিকে উড়ে পালাল।

বাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে জননী সাউ পাখিদের এই দুর্দশা দেখে মনে মনে অতিশয় বেদনাবোধ করছিলেন; আরেকটি সিঁড়িতে নেমে সাউ গাছের আড়াল থেকে গুহার দিকে তাকালেন। উদ্বেগে মন ভরে উঠেছে। সকাল থেকে বাড়িতে পায়চারি করেছেন, কোনো কাজ করতে পারেন নি। ওঁর মেয়েরা স্যু আর কোয়েন দুজনে গুহায় গেছে। এতে অবশ্য চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু ছোট্ট থুয়া?

স্যাম হোন দাৎ-এ পৌঁছেই জানতে চেয়েছে—তোমার মেয়ে দুটি কোথায়?

—ওরা ভয় পেয়ে পালিয়েছে। কোথায় যে গেছে তা জানি না।

—বুড়ো ডাইনি! ওরা নিশ্চয়ই গুহায় গেছে। আমি তোমাকে আগে থেকে বলে রাখছি, ওদের মাথা আমরা এই যাত্রায় কেটে নিয়ে তবে ফিরব। তাছাড়া গেলবারের মত শুধু চলে যাবো না। এখানে একটা ঘাঁটি বসিয়ে যাবো। গুহায় পালালে কি প্রাণ বাঁচবে। আমরা গুহা আক্রমণ করব। তারপর সকলের পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি টেনে বার করব। আমাকে তো জানো?

এইভাবে ভয় দেখিয়ে স্যাম ওর লোকজন নিয়ে চলে গেছে। একটু পরেই জাহাজ থেকে বড় বড় কামানের গোলা হোন দাৎ

পাহাড় লক্ষ্য করে পড়তে লাগল। বাড়িঘর সব কাঁপতে থাকে। জননী সাউও নিজের গুপ্ত আশ্রয়ে লুকিয়েছিলেন। এইভাবে গোলার আঘাতের পর গুহার কাছে অবিরাম গুলিবর্ষণ চলল।

জননী সাউ একটা মই দিয়ে ছাদের ওপর উঠে দেখার চেষ্টা করলেন। গুহার কাছের গাছগুলি শেলের আঘাতে ছিন্নভিন্ন।

ঠিক এই সময় মিসেস হাই থেপ এসে হাজির। তিনি চীৎকার করছেন –জননী সাউ! জননী সাউ! কোথায় তুমি!

বৃদ্ধাকে দেখতে না পেয়ে মিসেস হাই থেপ প্রাণপণে চেঁচাতে থাকেন।

মই থেকে জননী সাউ জবাব দেন—এই যে আমি এইখানে—!

হাই থেপ গিন্নী চোখ তুলে বলেন -ওমা, তুমি ঐখানে। কিছু দেখতে পাচ্ছ কি?

না, কিছুই না। খালি ভাঙা ডালপালা।

জননী সাউ নেমে এলেন, তারপর হাই থেপ গিন্নীর হাত দুটি ধরে কান্নাভরা কণ্ঠে বল্লেন ওরা ভাই গুহা আক্রমণ করেছে। কি যে হবে ভেবে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আমাদের হাতে তো বেশী অস্ত্রশস্ত্র নেই।

হাই থেপ গিন্নী বাচ্চাটাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে বলেন—শুনতে পাচ্ছ? পেশাদারী সৈন্যরা অতো চেচাচ্ছে কেন বলো তো!

জননী সাউ কিন্তু সেনাদের চীৎকার শুনতে পাচ্ছেন না।

হাই থেপ গিন্নী নীচুগলায় বলেন কিছু ভেবো না দিদি। আমার স্বামী বলেছেন, গুহায় ঢোকা অতটা সহজ হবে না। আমরা প্রাণপণে লড়ব।

–না, এখনই অবশ্য কিছু হবে না। কিন্তু যদি বেশীদিন ঘেরাও করে রাখে, কি হবে? কি খাবে ওরা সব?

—ভয় নেই দিদি। যথেষ্ট চাল আছে ওখানে।

জননী সাউ পান তৈরী করে মুখে ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে

থেকে বললেন—কিন্তু ভাই বলো দেখি, ভাত রাঁধবার জলটা কোথায় পাবে? শুকনো চাল চিবোতে হবে নাকি?

মিসেস হাই থেপ ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। তিনি জানতেন নদীতে পাহারা বসেছে। শুধু বললেন—আমাদের লোকজন চালাক আছে, ওরা ঠিক কায়দা করে ভাত ফুটিয়ে নিতে পারবে।

মিসেস হাই থেপ চলে যাওয়ার পর জননী সাউ বসে বসে ভাবতে থাকেন বাকী সকালটুকু ধরে। তাম চেন হাই থেপদের বাড়ি আজ দু'রাত আত্মগোপন করে আছে। কেউ জানে না, জননী সাউ পর্যন্ত নয়।

বৃদ্ধা শুয়োরগুলোকে খেতে দিলেন। যান্ত্রিক ভঙ্গীতে তাদের ডাকলেন, তারপর তাদের খাবার দিতে দিতে গুহায় তাঁর নিজের সন্তানদের কথা চিন্তা করতে থাকেন, দুটো মেয়ে, বিশেষ করে নাতনী থুয়া, এদের জন্যই তিনি বেঁচে আছেন। নাগান তাঁর ভবিষ্যৎ জামাতা, আরো যারা আছে তারাও যেন একই পরিবারের মানুষ। এখন সবাই বিপদের মুখে। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে কি যে হবে তাই উদ্বেগাকুল চিত্তে ভাবতে হচ্ছে। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা তাঁর কাছে নতুন নয়, কিন্তু এখন তাঁর উদ্বেগ বেড়েছে, সমস্যা বেড়েছে- এতদিক থেকে এত সমস্যা এক সঙ্গে আগে আর হাজির হয় নি।

অন্ধকার হয়ে এল, জননী সাউ আলো জ্বাললেন। এই আলোতে বাড়ির শূন্যতা যেন আরো বেড়ে গেল। একটি জায়গায় বসে থাকতে ভালো লাগে না, জননী তাই উঠে তিনটি ধূপকাঠি জ্বালালেন। তার পর স্বামীর সমাধির সামনে হাত জোড় করে প্রার্থনা জানান—হে আমার স্বামীর আত্মা, আমার মেয়ে দুটো আর থুয়াকে তুমি রক্ষা করো সকল বিপদ থেকে…।

নিত্য প্রণাম সেরে ধূপকাঠি ধূপদানে রেখে দেন জননী সাউ।

সহসা মেগাফোনে ঘোষণা শুরু হল। জননী সাউ তাড়াতাড়ি দোর গোড়ায় গিয়ে হাজির হন। ঘোষণায় বলছে—জনতার প্রতি

নোটিশ। ভিয়েৎনাম রিপাবলিকের সেনাদল এতদ্বারা হোন দাৎ-এর জনগণকে জানাচ্ছি যে আজকের সংঘর্ষে অনেকগুলি কম্যুনিস্ট দস্যুকে নিহত করা হয়েছে। যারা বেঁচে আছে তারা গুহায় আত্মগোপন করে আছে, আত্মসমর্পণে রাজী নয়। সেনাদল ওদের নিশ্চিহ্ন করবে। আমরা সবাইকে সতর্ক করে দিচ্ছি কাল সকাল ৯টার পর কেউ যেন নদীর কাছে না যায়।

নদীর ধারে যাবে না? কি ভেবেছে ওরা। আমাদের মধ্যে অনেকে নিহত হয়েছে। মিথ্যে কথা। ওরা গুহায় যাওয়ার আগে মাত্র দুজনকে আহত অবস্থায় নিয়ে যেতে দেখেছি। থাম আর বাচ্চা বী আহত হয়েছে। আরও আহত হয়েছে নাকি?

মেগাফোনের আওয়াজ থামতেই গলিপথে একটা কচি গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। আলোটা হাতে করে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই দেখা গেল একটা কালো কুকুর লেজ নাড়ছে, তার পিছনে ছায়ামূর্তি। তু বাউ-এর ছোট ছেলে। জননী প্রশ্ন করেন—কে উট নাকি?

-হ্যাঁ, দিদা, আমি উট।

একটা পুরোহাতা কালো জ্যাকেট ওর গায়ে। নীচের দিকটা প্যান্টের ভিতর ঢোকানো। সে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে--দিদা, বাবা এইখানে শোবার জন্য বললেন। আপনি একা আছেন তাই -।

—বেশ, তা এত হাঁফাচ্ছ কেন? বাড়ি থেকে সোজা দৌড়ে এসেছ নাকি!

হাঁ।

তের বছর বয়সের পক্ষে ছেলেটি বেশ শক্ত। উটের গায়ের রঙটা বাদামি। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। কুকুরের সঙ্গে একটু খেলা করে উট বলে —দিদা হাঁড়িতে ভাত আছে নাকি?

—তুমি এখনও কিছু খাওনি নাকি?

--খেয়েছি, সেই সন্ধ্যের আগে।

আলোটা হাতে তুলে জননী বলেন– তাহলে আমার সঙ্গে এসো।

উট রান্নাঘরের পথে জননীকে অনুসরণ করে। জননী একটি পাত্রে ভাত আর একটি পাত্রে মাছ সাজিয়ে দিলেন। ছেলেটি গোগ্রাসে খেতে শুরু করেছে।

জননী সাউ বললেন– আমিও কিছু খাইনি। তোমার বাবা এসেছিলেন। বললেন, তোমার বড় ভাই আহত হয়েছেন। তার জন্য উদ্বেগ বুঝতে পারলাম। তবে উনি কিছু বলেন নি।

--বাবা বলেন, যুদ্ধের সময় অমন হয়।

— আর তুমি? তোমার কি ভয় আছে নাকি?

-আমি, না। আমার ভয় নেই। আমি গ্রেনেড দিয়ে ওদের সবাইকে ঘায়েল করব।

জননী সাউ হাসলেন - তোমাকে কে গ্রেনেড দিচ্ছে।

উট কি একটা বলার জন্য মুখ খুলছিল, কিন্তু কি ভেবে চুপ করে গেল। ভাত শেষ হল। সে আবার দুটি ভাত নিয়ে নিল।

আহারান্তে একটি খাটে উটের শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে জননী সাউ তাকে একটি কম্বল দিলেন। কম্বলটা সারা গায়ে চাপা দিয়ে মুখ পর্যন্ত ঢেকে দেয় উট। জননী সাউ কিছুক্ষণ নীরবে পান চিবিয়ে বলেন—থুয়াটা গুহায় কিভাবে শোবে কে জানে? রাতে যদি হামলা হয়।

রাতে কোনো হামলা হতেই পারে না।

জননী সাউ প্রশ্ন করেন - তুমি কি করে জানলে? তুমি সব জানো, না?

—সত্যি বলছি দিদা। আমার খুব মজা হত থুয়ার জায়গায় আমি যদি গুহায় থাকতাম। শুধু···?

—কি শুধু?

—কি জানেন দিদা, গুহাতে আমাদের যাঁরা শত্রুদের হাতে নিহত হয়েছেন, ওঁদের ভূত যদি আমাকে তাড়া করে ?

জননী সাউ কড়া গলায় বললেন- –কি বোকামি হচ্ছে ? কি করে তুমি বিশ্বাস করো, যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁরা এসে তোমাকে ভয় দেখাবেন ? এখন থেকে এসব বোকার মত কথা আর বোলো না, বুঝলে ?

এই ধমকানি খেয়ে ছেলেটা চুপ করল। জননী সাউ পান চিবোতে চিবোতে দরজাটা বন্ধ করলেন। তারপর আলোটা নিভিয়ে দিয়ে নিজের বিছানার দিকে চললেন।

উট কম্বলের ভিতর থেকে মুখ বার করে বলে—দরজাটা ঠিক বন্ধ করেছেন তো দিদা ?

উট আবার আপাদমস্তক মুড়ি দেয়। কিন্তু সে অস্বস্তিভরে এপাশ ওপাশ করে। জননী সাউ বিস্মিত হলেন। ছেলেটা ঘুমোচ্ছে না কেন ! দরজা বন্ধ করা না করা নিয়ে এত চিন্তা কেন। সাধারণত এতক্ষণে ওর নাক ডাকার কথা। বোধ হয় একটু বেশী খেয়েছে তাই ছটফট করছে।

জননী সাউ শুয়ে শুয়ে গুহার কথাই চিন্তা করেন।

উট কিন্তু জেগেই আছে। তার ভাবনা অন্যরকম। একটি নূতন চকচকে এম কে-৩ গ্রেনেড এখন ওর নিজের। একটু আগে জননী সাউকে প্রায় বলেই ফেলেছিল। ঠিক সময়ে সতর্ক হয়ে গেছে। একটু আওয়াজ হলেই সে চমকে উঠছে। কুকুর ডাকলেই সে সচকিত হয়ে ওঠে। একটু বেগতিক বুঝলেই সে পিছনের দরজা দিয়ে পালাবে। এই ছাদটা বেশ উঁচু তবে তেমন উঁচু নয়, ও ঠিক লাফিয়ে পড়বে।

কেন যে এই উদ্বেগ তা শুধু সেই জানে। আজ বিকালে সে তাড়াতাড়ি খেয়েছে ঠিকই। ওর বাবা বলেছিলেন, আজ তুমি সাউ দিদার বাড়ি গিয়ে শোবে, তিনি একা আছেন।

উট তখনই রাজী। এবং সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ওর কুকুরটাকে নিয়ে। নদীর ধারে নারকেল-কুঞ্জের কাছে শত্রু সেনাদল বসে ছিল। ওকে দেখে তারা বলে উঠল --

—এই ছোকরা, শোন—

– কি চাও তোমরা ?

—নারকেল গাছে উঠতে পারো ?

কাজটা ওর পক্ষে সহজ হলেও ও প্রথমটায় বলতে গিয়েছিল—না জানি না। কিন্তু ঠিক এই সময় দেখল সেনারা যেখানে বসে আছে তার পাশে পড়ে আছে চকচকে গ্রেনেড আর কার্টিজের বেল্ট। তাই উট মত পরিবর্তন করল। ওদের সঙ্গে ভাব করাই ভালো।

তাই উট বলে—নিশ্চয়ই, আপনারা কি নারকেল চান ?

-হাঁ। খোকা, গাছে উঠে পড়ো।

– আচ্ছা।

সৈনিকরা তো মহাখুশি। সে একেবারে কাঠবেড়ালীর মত গাছে উঠে পড়ল। তারপর গাছ থেকে অনেকগুলি নারকেল নীচে ফেলে দিল। প্রতিটি সৈনিক একটি করে ডাব পাবার পর সে নেমে এল। ওরা ওকে একটি ডাব দিল। উট সবিনয়ে বলে আমি তো রোজই খাই, বুঝলেন।

সেনারা নিজেদের ছুরি দিয়ে ডাব কাটছিল। ভালো পারছিল না। তাই উট কেটে দিল বেশ ভালো করে।

পেট ভরে ডাব খেয়ে সেনারা আড হয়ে শুয়ে পড়ে 'ভং কো' এই প্রিয় গানটি গাইতে শুরু করে।

উট একটা মহা খুশি খুশি ভাব দেখায়। সে বলে তোমরা গান করো—আমি জিভ্ দিয়ে সুর বাজাব, কেমন ?

কে তোমাকে শিখিয়েছে ?

কেউ শেখায়নি। নিজেই শিখেছি।

ওরা উটের অজস্র প্রশংসা করে। উট এই প্রশংসায় অচঞ্চল। সেনারা গল্প করে চলে। উট নজর রেখেছে গ্রেনেডের দিকে। সেও নানারকম গল্প করে ভুলিয়ে রাখছে ওদের। সমুদ্রে দুটি অতিকায় দানব আছে, হোন ট্রি আর হোন কুয়োর মাঝে দেখা যায়।

ওরা জানতে চায়, সে স্বচক্ষে দেখেছে কিনা।

—আমি একটাই দেখেছি। তা ছাড়া এখন একটাই আছে। যখন দুটো ছিল তখন নৌকা ডুবিয়ে দিত, নৌকার আরোহীদের খেয়ে ফেলত।

উট গল্পটা শেষ করতে করতে অন্ধকার হয়ে এল। সমুদ্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে উট বলে প্রায়ই দেখা যায়। সেনারা যখন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে ও সেই সুযোগে একটি গ্রেনেড সরিয়ে পকেটে রাখল। সে উঠে পড়ে বলে —আমাকে এখন যেতে হয়। আচ্ছা স্যার নমস্কার।

সেনারা বলল মাঝে মাঝে এসো কিন্তু।

—আপনারা কি এখানে অনেকদিন থাকবেন?

—হাঁ, ঐ গুহার ভেতরকার ভিয়েৎকঙদের শেষ না করে যাচ্ছি না।

উট ধীরে ধীরে উঠে পড়ে। কুকুরটাও ওর পিছু নেয়। চোখের আড়াল হতেই সে প্রাণপণে দৌড়তে লাগল। জননী সাউ-এর বাড়ির কাছে এসে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে জিনিসটা পুঁতে রেখে ভালো করে চাপা দিয়ে একটা চিহ্ন রেখে তারপর জননী সাউ-এর বাড়ি এসেছে।

উটের মানসিক উদ্বেগের কারণ এইটেই।

সাত

গুহার ভেতরকার পাথরের ওপর নিভন্ত বাতিটা কম্পমান। অনেকখানি মোমের ওপর সামান্য সলতেটুকু জ্বলতে জ্বলতে নিভে গেল। গুহার ভিতরকার এই আলোকিত অঞ্চলটা অন্ধকার গ্রাস করল। ফলে কোয়েনের ছায়াটা গুহা-গাত্র থেকে মুছে গেল। যে সময় বাতিটা নিভে গেল তখন কোয়েন ঢুলছিল, পাশে বী বেশ শান্তভাবে ঘুমোচ্ছিল।

প্রভাত হয়ে আসছে।

বাইরের আকাশ হয়ত পরিষ্কার হয়ে এসেছে, কিন্তু গুহার ভিতর এখনও অন্ধকার। সকাল আসন্ন হয়ে আসায় শীতও বাড়ছে। সহসা ঘুম ভেঙে সু-র পাগুলি যেন অসাড় হয়ে এসেছে মনে হয়, এমনই শীত। ওর গায়ে থুয়ার হাত জড়ানো, থুয়ার মাথাটা ওর বুকে। সু থুয়ার পা-টা স্পর্শ করে দেখে সেই পা ছুটিও ঠাণ্ডা। একেবারে বরফের মত।

হাতের বাতিটা ধরে সু তার মেয়েকে ভালো করে দেখে নেয় অনেকক্ষণ ধরে। মা উঠে পড়ায় থুয়া এখন একাই একটি চৌকো নাইলনের ওপর শুয়ে আছে। সু-র মনে এই দৃশ্যটি লাগে। থুয়া বেশ ঘুমোচ্ছে। ওর মাথায় কোঁকড়ানো চুল মুখের ওপর এসে পড়েছে।

সাত বছরেরও বেশী এই ছোট্ট মেয়েটির জন্যে সু-র হৃদয় মন পড়ে আছে। এমন চালাক, এমন মধুর সন্তান ওদের ছুজনের। অর্ধেক ওর আর বাকী অর্ধেক ওর স্বামীর, যিনি উত্তর ভিয়েতনামে।

ছু বছর আগে ধরা পড়ে মার্কিন আর দিয়েম-পন্থীদের হাতে নির্যাতন সহ্য করলেও কষ্ট বেশী হয়েছে তার থুয়াকে ছেড়ে থাকার জন্যে। এই হোন দাৎ-এর মানুষদের তীব্র সংগ্রামের ফলে সে অবশেষে মুক্তি পেয়েছে। তারপর থুয়াকে বুকে নিয়ে শিশুর মত কেঁদেছে।

সু ভাবে, এই মুহূর্তে ওর স্বামীও হয়ত উত্তর ভিয়েতনামে ঘুমিয়ে আছেন। তিনি হয়ত কল্পনা করতে পারবেন না যে তাঁর স্ত্রীকন্যা গুহায় রাত্রিযাপন করছে।

সহসা পকেটে হাত পড়তে একটা কাগজ খসখস করে ওঠে। এ সেই মূল্যবান চিঠি। স্বামীর চিঠি।

এমন সময় থুয়ার ঘুম ভেঙে গেল। সে চেঁচিয়ে ওঠে, মা—!

সু বলে এই যে আমি। তুমি ঘুমোও, আমি তোমার জন্যে একটু জল গরম করে নিই।

থুয়া বলে—না, মা, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

তারপর থুয়া বলে আমি একটা 'সোপন' দেখলাম মা গো—!

সু বলল ছিঃ থুয়া, সোপন নয়, স্বপ্ন।

—হ্যাঁ মা, স্বপ্ন দেখছিলাম। একটা পরী, কি সুন্দর! কি চমৎকার ডানা। নিশ্চয়ই—থাম মামা কাল যে পরীটার কথা বলেছিল এ সেই পরী। দেখতে ঠিক কোয়েন মাসীর মতো। যখন আমাকে ডাকল তখন গলাটা ঠিক মাসীর মতো। আমাকে ডানা নেড়ে বলল, তাড়াতাড়ি আমার ডানায় উঠে পড়ো, আমি তোমাকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাবো শুনে আমার আনন্দ হল। আমি বললাম—একটু দাঁড়াও, মাকে ডেকে আনি, মাও যাবে। পরী মাথা নাড়ল, আর আমি তোমাকে গলা ছেড়ে ডাকতে লাগলাম। তারপর ঘুম ভেঙে গেল, তোমাকে দেখলাম। তাই তোমাকে ডাকলাম।

বিস্মিত সু থুয়াকে প্রশ্ন করে পরীকে দেখেই কি তুমি একটু আগে কাঁদছিলে?

থুয়া মাথা নাড়ল।

থুয়াকে সু বলছিল—বেশী জল খেয়ো না। আজ থেকে জল কম খেতে হবে।

এমন সময় কোয়েন এসে থুয়াকে সশব্দে একটি চুমা খেল, তারপর তার পাশটিতে বসে পড়ে। থুয়া মাসির গলা জড়িয়ে ধরে উদ্বেগভরা কণ্ঠে চুপে চুপে প্রশ্ন করে মাসী! বা কি মারা যাবে নাকি?

না, কখনই নয়। ছি ওসব বোকার মত কথা বলতে নেই।

কোয়েন থুয়াকে কোলে বসিয়ে তার বোনকে বলে বা এখন অনেকটা ভালো আছে। এখন ওর হাতটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। কষ্টটা আর তেমন নেই। গত রাত্রে একটু ঘুমিয়েছে।

—সেটা ভালো। তবে সাবধানে থাকবে। নজর না রাখলেই মারা যাবে।

—না, না, কখনই নয়। আমি সমানে লক্ষ্য রেখেছি। ওর নাড়ি স্বাভাবিক। আমাকে জিজ্ঞেস করছিল ভোর হয়েছে নাকি। তারপর বলল, 'আমি সেরে উঠব, কি বলো দিদি, তাই নয়?'

কোয়েনের কথা শুনতে শুনতে সু-র চোখ জলে ভরে উঠল। থুয়া কোয়েনের বুকে মুখ লুকোয়।

কোয়েন বলে-- ও যে এতখানি সাহসী, তা আমি ভাবিনি।

সু বলল—ও নিশ্চয়ই ভারী কষ্ট পেয়েছে। হাতটা কাটা গেল, কষ্ট হবে না? আহা ছেলেমানুষ!

কোয়েন বলল—হাতটা কাটার পর নাম নো আর আমি কেঁদে ফেলেছি। হাই থেপ কিন্তু অটল অচল। উ ন বীকে কোলে করে বসেছিলেন। বেচারী বী অজ্ঞান হয়ে গেল। সবাই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারপর যখন চোখ মেলে দেখল, তখন আমরা সবাই এমনই স্বস্তি পেলাম যে প্রায় পড়ে যাওয়ার যোগাড়।

সু উঠে দাঁড়ায়। বলে আমি ওকে একটু দেখে আসি। কোয়েন প্যানটার দিকে একটু নজর রাখো। ওতে সিকি লিটার জল দিয়ো।

থুয়া মাসির কোল থেকে মুক্তি নিয়ে মার পিছু নেয়।

কোয়েন জ্বালানি কাঠ উনুনে দিয়ে অপেক্ষা করে। জল ফুটতে আরম্ভ করেছে, প্যানটা মাটিতে বসিয়ে কোয়েন ওদিকের বারান্দার দিকে যায়। প্রতিটি পদক্ষেপে ছায়া ক্ষীণতর হয়ে আসে। প্রভাতের আলো ছড়িয়ে পড়ছে বিনিদ্র রজনীর পর তার মাথাটা হালকা। সে যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি আশ্চর্য দিনগুলি। দিনের বেলা লড়াই, আর নিদ্রাহারা রাত। গত চব্বিশ ঘণ্টায় কতবার বুকটা উদ্বেগে আকুল হয়ে উঠেছে, প্রেম, সুখ আর উদ্বেগ!

অন্ধকার সত্ত্বেও সোজা নাগানের জায়গাটিতে গিয়ে পৌঁছোল কোয়েন। কোথাও এতটুকু হোঁচটও লাগেনি। সাধারণত কোয়েন একটু গম্ভীর প্রকৃতির, আজ কিন্তু সে নাগানের গলাটি শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। এই অভিব্যক্তিতে নাগান বিস্মিত হয়। তবে তখনই বুঝতে পারে। এই উচ্ছ্বাস সাধারণ ভাবাবেগ নয়। তাই এর উত্তরটাও সাধারণ ধরনের নয়, এমন কি কোয়েনকে সে একটু চুমোও খায় না। শুধু কোয়েনের মুখখানি তুলে ধরে গভীরভাবে দেখতে থাকে। আধা-আলো অন্ধকারে মুখটি ভালো করে দেখাও যায় না—তার নিঃশ্বাস ওর মুখে এসে পড়ে। নাগান বুঝতে পারে ওর ওপর দিয়ে কি গুরুতর চাপ যাচ্ছে।

সে প্রশ্ন করে - এত খুশি খুশি কেন কোয়েন? কারণ কি?

কোয়েন ওর হাত দুটি ধরে বলে--কিছু না, সত্যি কিছু না।

সত্যি কথা বলতে কি, কেন যে এই খুশি জেগেছে মনে তা সে নিজেই জানে না। হয়ত গুহার দ্বারে শত্রুর চীৎকার কিংবা তার বোন সু-র অতি সতর্ক জল পরিবেশন—কিংবা হাতটা কেটে বাদ দেওয়ার সময় বী ওর হাতটা অত জোরে চেপে ধরেছিল সেই আশ্রয় দিতে পারতো। সত্যি এই সব জড়িয়ে এতটা খুশির ভাব মনে জেগেছে - !

সে প্রশ্ন করে তুমি কি রাতে ঘুমোতে পেরেছো নাগান?

--হ্যাঁ, আমরা পালা করে ঘুমিয়েছি। সবাই একটু করে ঘুমিয়ে নিয়েছে।

—নাম নো আর আমিও তাই করেছি। সে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বীকে দেখেছে, তারপর আমার পালা ছিল সকাল পর্যন্ত।

-কেমন আছে ছেলেটা? ভালো?

—অনেকটা ভালো। আমি তো ভয়ে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। আমি কাল ওর বুক দেখেছি আর নিশ্বাস অনুভব করেছি।

কোয়েন নাগানের বেল্ট থেকে জলের পাত্রটি খুলে নিয়ে নেড়ে

দেখে, একবিন্দুও জল নেই। নীরবে সে সকলের জলপাত্র সংগ্রহ করে গুহায় ফিরে যায়।

সবগুলি ভর্তি করে আবার যখন গুহার মুখে এসে পৌঁছেচে তখন নাগান চিৎকার করছে— সাবধান। ওরা আসছে।

ছটি তিনটি ছায়া মূর্তি—গুহার সামনে এসে দাঁড়াল। পাঁচিলে পিঠ দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করার আগেই কি একটা লেগে সে পড়ে গেল। এরপর একটা টমসনের ভীষণ আওয়াজ শোনা গেল, তারপর পর পর অনেকগুলি। কোয়েন দেখে তার উলটো দিকে টয তার টমসন দিয়ে গুলি ছোঁড়ার উদ্যোগ করছে, কোযেন বোঝে সেই তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে।

গুহার প্রবেশপথ আবার ফাঁকা হয়ে এল। আর কোনো শত্রুসৈন্য এলো না। কিন্তু সহসা গুহাব সামনে তীরের মত কী যেন এসে গেল এবং গুহাব ভিতর গ্রেনেড এসে পড়তে লাগল পাথর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

নাগান চিৎকাব ক'' —গ্রেনেড। টেক কভাব। ছাড়ালে যাও।

গ্রেনেড মাটিতে পড়ে গড়িয়ে যায়। আর সেইসব গ্রেনেড বিস্ফোরিত হওয়ার আগেই আরো গ্রেনেড এসে পড়তে থাকে। কয়েকটা ভিতরেও এসে পড়ে।

বজ্রনির্ঘোষে বিস্ফোরণের ফলে গুহাব ভিতবেও ঘন ধোঁয়াব কুণ্ডলী পাক খেতে থাকে। কোয়েনের পিঠে কি যেন লাগল।

বিস্ফোরণেব আওয়াজে কান ফেটে যায় প্রায়, কোয়েনের নাকে বারুদের তীব্র গন্ধ আসে।

সহসা নাগান বলে ওঠে --পিছিয়ে যাবার জন্য তৈবী হও। আমি 'রান' বললেই সবাই পিছে হটে যাবে।

আবাব বিস্ফোরণেব বজ্রনিনাদ। গতকালের মত শত্রু গুহার ভিতর প্রবেশের চেষ্টা করছে না। ওরা গুহার প্রবেশপথে এদিক

থেকে ওদিক লাফিয়ে যাচ্ছে আব ভিতরে এম কে (৩) গ্রেনেড ছুঁড়ছে। অন্যরা পাহাড়েব পিছন থেকে গ্রেনেড ছুঁড়ছে। গুহার সংকীর্ণ পথে বিস্ফোরণ এমনই তীব্র যে প্রতিটি আওযাজ যেন কোয়েনেব বুকখানা নিষ্পেষিত করে দিচ্ছে। তাব বুকটাব ওপর যেন একখানা ভারী পাথব চাপা দেওয়া হয়েছে।

এই ধরণেব গ্রেনেড বর্ষণেব ভিতব পাহাড়েব আড়াল দিয়ে গুহার ভিতব ঢোকা বড় সোজা ব্যাপাব নয়, রীতিমত কৌশল চাই। নাগান উপযুক্ত মুহূর্তেব অপেক্ষায় আছে। এম কে (৩)-র উৎপাতে সুযোগ পাচ্ছে না। যে মুহূর্তে যে সববাব উদ্যোগ করছে তখনই গর্জন শোনা যাচ্ছে, আবার পাহাড়েব গায়ে পিঠ লটকাতে হচ্ছে। সে মনে করে এইভাবে গ্রেনেড বর্ষণ করে জমি তৈরী করে ওরা এসে আক্রমণ করবে, আমবা একেবারে সময় পাবো না। একটি গ্রেনেডেব পিন উঠিয়ে নাগান বলে গ্রেনেড রেডী রাখো।

নাগান ভাবে আমাদের যদি মরতে হয়, এক সঙ্গে এইখানে মরতে হবে। সহসা হঠাৎ সব থেমে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠে নিজের টমসনটা এক হাতে নিয়ে আরেকটি এম কে (৩) বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে—এখন পালাও। সবাই দৌড়য়। নাগান এই পলায়নকে সাহায্য কবার জন্য কয়েকটা গুলি ছোঁড়ে। তারপর সে দৌড়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়। গুহার ভিতরকার প্রথম বাঁকটিতে পৌঁছেই ও সবাইকে বলে- হল্ট। দাঁড়াও।

গ্রেনেড এতদূর এসে পৌঁছোবে না। তা ছাড়া পাহাড়ঘেরা বলে গ্রেনেডের ধাক্কাটা লাগবে না। সবাইয়ের কাছে পৌঁছে নাগান শুনতে পায়, সবাই বলাবলি করছে- -কোয়েন কোয়েন !

নাগান চিৎকাব করে —কোয়েন ! কোয়েন কোথায় তুমি ?

কোনো উত্তব নেই। নাগান আবার সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

ট্রয় চীৎকার করে বলে—না নাগান তুমি থাকো, আমি যাচ্ছি।

নাগান কিন্তু অদৃশ্য হয়েছে। একটা বাঁক থেকে আব একটি

বাঁক কোনো রকমে গুড়িমেরে চলছে নাগান, আর তার প্রিয়তমরি নাম ধরে ডাকছে।

সহসা পায়ে কি একটা লাগল। এ কোয়েনের দেহ। সে উপুড় হয়ে পড়ে আছে, তার একটি হাত দেহের নীচে চাপা রয়েছে। ভীত নাগান তাকে তুলে নিয়ে ভালো করে শোনে নিঃশ্বাস পড়ছে কি না। নিঃশ্বাস পড়ছে। তার দেহ পরীক্ষা করে দেখে। কোথাও রক্ত ঝরছে না। কাঁধের ওপর বন্দুক ঝুলিয়ে নিয়ে কোয়েনকে কাঁধে ফেলে নাগান আবার গুহার অভ্যন্তবে চলে যায়।

বাইরে পবিপূর্ণ দিনের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। এক মোটা-সোটা কাপ্তেন হাতে পিস্তল নিয়ে সেনাদেব হুকুম দিচ্ছেন—আর একবার। কেসেব ভেতব যত গ্রেনেড আছে ব্যবহার কবে ফেল।

সেনারা দৌড়ে যায় গ্রেনেডের কেসগুলি খুলতে। তাবপর একেবাবে আনকোবা এম কে (৩) নিজেদের মধ্যে পবিবেশন করে। প্রত্যেকে দুটি কবে গ্রেনেড হাতে নিয়ে সতর্কভঙ্গিতে গুহার প্রবেশ-মুখে লাইন দিয়ে দু-পাশে দাঁড়ায়, তাবপর দাঁত দিযে টেনে গ্রেনেডেব পিনগুলি খুলতে থাকে—ওবা খোলা পথে গ্রেনেড ছুঁড়ে গুহার ভেতর ফেলবে।

আগেরদিন দুজন মার্কিন উপদেষ্টা এসে পৌঁছেচেন। ভোর বেলায় কাপ্তেন হুকুম দিয়েছেন. চল্লিশকেস গ্রেনেড খুলতে হবে। প্রতিটি কেসে কুড়িটি গ্রেনেড আছে। দশটি কেস ইতিমধ্যে খোলা হয়েছে। গুহাব প্রবেশ মুখে ঘন ধোঁযাব জাল। কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তবে কাপ্তেন তাঁব আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। ওঁর লোকজনের পাগুলি ক্লান্তিতে দুর্বল আব গ্রেনেডের পিন দাঁত দিয়ে খোলার জন্য দাঁতেও ব্যথা।

চল্লিশ কেশ গ্রেনেড খরচ করতে করতে সূর্যদেব মধ্য গগনে প্রখর হয়ে উঠলেন। চারদিকে ধোঁয়ায় জাল জমে গেছে। কাপ্তেন হুকুম দিলেন, গুহার প্রবেশ-মুখে জোর করে ঢুকে পড়। লোকগুলি

ইতস্ততঃ করে। কাপ্তেন ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে চিৎকার করে ওঠেন--চুলোয় যাক্। ওরা গুহার ভিতব সবাই মরে আছে। কিসের ভয় তোমাদের ?

ওঁর হাতে কোল্ট ১২ পিস্তল, পিস্তল উঁচিয়ে কাপ্তেন বলেন—যত সব শুয়োরের বাচ্চা—হটে যাও, আমি নিজেই যাবো।

উদ্ধত ভঙ্গিতে কাপ্তেন প্রবেশপথে ঢুকে পড়েন। অনুরূপ উদ্ধত ভঙ্গিতে তাঁর রক্ষী সেনারা তাঁকে অনুসরণ করে। কিন্তু গুহার ভিতর পা দিতেই একটি বুলেট এসে একেবারে ওঁর মুখে লাগল। কাপ্তেন মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর হাতের অব্যবহৃত পিস্তল খসে পড়ল। রক্ষী দুটি তাঁকে ফেলে রেখেই পালালো। লোকটির লাল রঙের হাফ প্যাণ্টের মত লাল রক্তে তাঁর মৃতদেহ প্লাবিত হয়ে গেল।

সু বোনকে কোলে চেপে ধরে ডাকে—কোয়েন! কোয়েন! থুয়া ডাকছে—মাসী মাসী! কোনো সাড়া নেই।

ওর সারা অঙ্গে সু কোনো আঘাতচিহ্ন দেখতে পাচ্ছে না। নাগান ঠিক বলেছে, কোয়েন বিস্ফোরণের আওয়াজে এইরকম স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। সু তার বুকে মালিশের ভঙ্গীতে জোরে জোরে হাত ঘষে, কিন্তু কোয়েন অটল অনড়।

ওরা কোয়েনের জন্য একটি মোমবাতি জ্বালায়। বীর জন্য কোয়েনও এইরকম বাতি জ্বালিয়েছিল। বাতির মৃদু আলোয় কোয়েনের মুখখানি ছাই-এর মত সাদা দেখাচ্ছে। সু ভীষণ ভয় পেয়েছে। সু-র মনে পড়ে যেন অনেককাল আগে ও যখন বাচ্চা কোয়েন্‌কে কোলে পিঠে মানুষ করত, মার মত দোলা দিত, আজও কোয়েন যেন সেই অবস্থায়। বাবা ওকে একবার দেখেছেন আর সেইদিনই তাঁবেদার সামরিক বাহিনীর লোক এসে বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ওপর হত্যা করে। সু ভাবে কেন ওকে জল নিয়ে যেতে দিয়েছিল --!

থুয়া কোয়েনের পা দুটি ধরে আকুল হয়ে কাঁদছে। তার চোখ

ছুটি জলে ভেসে যাচ্ছে। কোয়েনের কিন্তু নিঃশ্বাস পড়ছে। হঠাৎ সু চেঁচিয়ে ওঠে—কোয়েন চোখ খুলেছে। ও ভালো আছে--তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে—কোয়েন, এই যে আমি!

কোয়েন ধীরে ধীরে চোখ খোলে। সুকে চিনতে পেরেছে।

একে একে সবাইকে চিনেছে। তারপর আবার চোখ বুঁজিয়ে, যেন আরো একটু ঘুমিয়ে নিতে চায়।

ভয়ে সু বোনের মুখখানি তুলে ধরে। তবে আশ্বস্ত হয়, কোয়েনের মুখে হাসির রেখা দেখে। কোয়েন চোখ খুলে বলে—আমি কোথায় দিদি!—তাব কণ্ঠস্বর দুর্বল।

—কেন, গুহাতেই আছো। কিছু মনে নেই কোয়েন?

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমার কোথায় লেগেছে?

—কোথাও লাগেনি।

—আমি মনে করেছিলাম যে আমাব গায়ে গ্রেনেড লেগেছে। আর জলের জায়গা? এবাব নিজের বুকে হাত রেখে বলে বুকটা কন্‌কন্ করছে।

সু বলে প্রায় হাজারটা গ্রেনেড ফেটেছে। তারই ফলে এরকম হয়েছে। তুমি যে মাবা যাওনি এ আমাদের ভাগ্য।

—ওরা এখনও আছে?

– আছে, তবে ভেতরে আসতে পারেনি।

–আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, না? কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম? কে আমাকে এখানে নিয়ে এল?

নাম নো বাধা দিয়ে বলে—কে আবার? তোমার নাগান গো!

কোয়েন বলে – সত্যি? আমার কিছুই মনে নেই।

· সবাই চলে এসেছিল, তুমি একটা গর্তের পাশে পড়েছিলে। যখন খোঁজ পড়ল, তখন নাগানই সাহস করে এগিয়ে গেল। আর একটু হলেই মরে যেতিস ঠিক।

কোয়েন আবার আগের মত হাসে।

সু উঠে গেল অন্য কাজে। থুয়া বসে রইল। কোয়েন তাকে কাছে টেনে এনে বলে—কি ভাবছিলি? মাসী অক্কা পেয়েছে না?

থুয়া মাথা নেড়ে এই প্রশ্নের সমর্থনে জবাব দেয়।

অনেক পরে নাগান এল। দূর থেকে কোয়েনের অলক্ষ্যে সে তাকে কিছুক্ষণ দেখল। ওর মুখটা শুকনো, উস্কোখুসকো, কপালে ঘাম ঝরছে। কোয়েন ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে নীরবে। তাই দেখে সে নীরবে হাসে। তারপর ধীরে ধীরে এসে হঠাৎ ওর পা-টা টেনে দেয়। কোয়েন লাফিয়ে উঠে পা সরিয়ে নেয়। নাগান ওর সামনে লাফিয়ে এসে হাজির হয়। কোয়েন ওকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বলে - স্টুপিড! তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।

— আর তুমি! একটু সেরে উঠতেই রসিকতা করছ। নমস্কার!

-- আমাকে ফেলে রেখে ত' সবাই চলে এসেছিলে?

নাগান বলে—তা ঠিক, আমি ভেবেছিলাম মরেই গেছ।

—অসম্ভব। তুমি না থাকলে আমি গুঁড়ি মেরে চলে আসতাম।

—তা বটে। আমি না থাকলে ওরা এতক্ষণে তোমাকে ধরে নিয়ে যেত। কি নিমকহারাম।

--বেশ! তাহলে এই নিমকহারামকে দোরগোড়ায় ফেলে রাখলে না কেন? নিয়ে এলে কেন ফিরিয়ে?

নাগান কোনো কথা না বলে শুধু হাসে।

সে বলে—তোমাকে এখানে নিয়ে আসার পর আবার অজস্র গ্রেনেড ফাটতে থাকে। তারপর আক্রমণ। আমি একজনকে শেষ করেছি। লোকটার গায়ে ছিল খুনখারাবি রঙের জামা। দুজন ওর দেহটা নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল। সুযোগ বুঝে দাং তার একটাকে শেষ করেছে। এখন ঝড়ের পরের শান্ত ভাব। বা রেন আর হাই থেপ এখন পাহারা দিচ্ছে।

নাগান চোখ বন্ধ করে। কোয়েন আরো কথা বলতে চায়, কিন্তু

আশ্চর্য, নাগান সেই অবস্থায় বসে বসে নাক ডাকায়। কোয়েন নিজের গলার রুমালটাকে পাট করে ওর মাথার নীচে দিয়ে দেয়। জামা দিয়ে মুছিয়ে দেয় মুখের ঘাম।

ওর কাজ শেষ হতে না হতেই হাই-থেপ কোথা থেকে চেঁচাচ্ছে- শীগগির এসো সব। রেডিওতে হো খুড়ো বলছেন।

চারদিকে আনন্দের আভাস। হো চি মিন খুড়ো বলছেন দ্রুতপায়ে সবাই ছুটছে। কোয়েন নাগান'ক উঠিয়ে দেয়।

-- নাগান উঠে পড়ো। উঠে পড়ো।

কেন ব্যাপার কি ?

—হো-খুড়ো রেডিয়োতে বলছেন, চলো তাড়াতাড়ি!

রেডিয়োর আওয়াজটা জোর করে দেওয়া হয়েছে। হো খুড়োর পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়ঃ

নববর্ষের দিনে উত্তরাঞ্চল সাত বছরের অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন করেছে এবং সোস্যালিজম গঠন করেছে। আর দখিন ভিয়েতনাম বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করে আসছে। মাকিন সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশটাকে একটা নয়া কলোনী বানাবার চেষ্টায় আছে। দখিন অঞ্চল দাসত্ব চায় না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আর তাদের তাঁবেদার দিয়েমপন্থীরা ধ্বংস ও শোকের বীজ বপন করছে...!"

কান্নার আওয়াজ। সু কাঁদছে। কোয়েন নিজেকে সংবরণের চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারল না। শেষকালে সবায়ের চোখে জল। প্রিয়তম প্রেসিডেণ্টের কণ্ঠস্বর এই গুহায় ধ্বনিত, ওদের অন্তরে সেই কণ্ঠস্বর প্রবেশ করছে, যেন তারা প্রেসিডেণ্টের বাক্যসুধা পান করছে।

এরপর কি চোখের জল আটকানো যায়?

এইদিন সন্ধ্যায় এতটুকু জলও আর কোথাও নেই। এমন কি রোগীদের সুপ বানাবার মত জলও নেই। হাই থেপ তার কাছে যেটুকু জল ছিল সুকে দিয়েছিল। হাই থেপ মাত্র ছ-এক চুমুক

জল খেয়েছে। তার দেখাদেখি সবাই সু-র পাত্রে যে যার জল ঢেলে দেয়। কিন্তু তাতেও পাত্র মাত্র অর্ধেক পূর্ণ হল। সুপটা বড় ঘন হয়ে যাবে। উনানের কাছে যেতে যেতে মনে পড়ল, থুয়ার জন্য প্রায় আধ লিটার জল আছে। সু ভাবে তাই দিয়ে কী আর থামের জন্য ভালো সুপ বানানো যাবে?

থুয়া ওখানে নেই। পাত্রটা হাতে নিয়ে সু ভাবে থুয়া বেচারী কী খাবে? একদিকে দুটি অসহায় আহত প্রাণী. অন্যদিকে নিজের শিশুকন্যা। শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে সবটুকু জল ঢেলে দিল সু।

সু নিজে কত কম জল খায়। কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত মাত্র এক চুমুক জল খেয়েছে। খিচুড়ি চিবিয়ে সেই যা একটু জল পেয়েছে। ইল নদীর জলের তরঙ্গ মৃদু। যদি রাতের অন্ধকারে গিয়ে একটু জল নিয়ে আসে ত কি হয়? নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। যাই হোক, শত্রুপক্ষ তো আর সব নদীটাই পাহারা দিতে পারবে না।

সুপ তৈরী করে বীকে খাওয়ানো হল। মুখটা মুছিয়ে দিতে সে বলে - আমাকে একটু জল দাও।

সু-কে সত্য কথা বলতে হয়। ছেলেটি ভ্রূ কোঁচকায়। বোধহয় কথাটা বিশ্বাস হয় না। সু তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলে --এক ফোঁটা জল কোথাও নেই। আজ রাতে লুকিয়ে গিয়ে মনে করছি জল নিয়ে আসব.

- যখন ফিরে আসবে আমাকে দেবে?

-নিশ্চয়ই।

সু উঠতে যাচ্ছিল, বী বলে—যেও না দিদি, একটু বসো আমার পাশে। আমার বড্ড বিশ্রী লাগছে।

. সু তার পাশে বসে সান্ত্বনার কথা শোনায়

রাত অনেক হয়েছে।

বা রেন বলে--নাও তাড়াতাড়ি, এই বেলা জল নিয়ে আসা যাক ওরা নদীর অন্য পারে ক্যাম্প করেছে।—এদিকে কিছু নেই।

—ঠিক বলছ তো!

—নিশ্চয়ই। তবে এখনই যেতে হবে, কোনো কিছু অদল-বদল হওয়ার আগেই।

সু বলে—বেশ। কোয়েন কলসীগুলি নিয়ে এসো।

কোয়েন বলে -চলো যাই।

হাই থেপ বাধা দিয়ে বলে—না, তুমি যেও না। তুমি এখনও দুর্বল।

কোয়েন বলে- না, আমি ভালোই আছি এখন।

বা রেন দৃঢ় গলায় বলে—তাহলেও তুমি থাকো।

সু বলে--সেই ভালো। কোয়েন তুমি থাকো, বরং নাম নোকে পাঠিয়ে দাও।

কোয়েন অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথাটা মেনে নেয়। এক মিনিট পরে সে নাম নোর সঙ্গে ফিরে এল।

ট্রং তার টমসন বন্দুক উঁচিয়ে ওদের আগে আগে চলে। বলে—চলো যাই।

মেয়ে দুটি ওদের ট্রাউজার হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে কলসী মাথায় নিয়ে চলল। গুহার প্রবেশ-মুখে নাগান এবং আরও সবাই বলল—খুব সাবধান কিন্তু।

বারুদের গন্ধে নাক বন্ধ হওয়ার যোগাড়। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে জোরে নিঃশ্বাস নিতে ভালো লাগে। গুহার ভিতরকার গন্ধটা বড় চড়া।

নদীর ধারে পৌঁছে নাম নো তার কলসীটা জলে চুবিয়ে দেয়। সু তাড়াতাড়ি তাকে অনুসবণ করে।

সু শান্তভাবে কলসীটা ভরে নেয়। ওর পাশে বসে নাম নো হাতের অঞ্জলি করে জল পান করে, তারপর কলসী মাথায় নিয়ে নদীর তীরে উঠে পড়ে। সু-র একটু জল ঐভাবে পান করার বাসনা থাকলেও সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে নাম-নোর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

নারকেল কুঞ্জের কাছে দাঁড়িয়ে সু মনে মনে ভাবে যাক সব বেশ ভালোয় ভালোয় কাটল।

বা রেন আর ট্রং পথ দেখিয়ে আগে আগে চলেছে, সু পিছনে। সু কয়েকবার গাছের শিকড়ে হোঁচট খেল, তার ফলে এই মূল্যবান জল কিছু নষ্ট হল।

আবার একবার হোঁচট খেতেই সু বসে পড়ে দু-চারটি পাতা খুঁজতে থাকে। কলসীর মুখে গুঁজে দিলে আর জল উপচে পড়বে না। সে উবু হয়ে পাতা খুঁজে আবার কলসীটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই কয়েকটা টর্চের আলো ওর মুখের ওপর এসে পড়ল।

একজন সৈনিক এসে চুলের মুঠি ধরল, তারপর মাটিতে ফেলে দেওয়ার জন্য জোরে টান দিল। সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট বা এগিয়ে এলেন দেখতে, ওঁর সেনারা কাকে নিয়ে টানাটানি করছে!

তিনি বললেন—হোন দাৎ-এ আগে এসেছ এমন কেউ এগিয়ে এসো।

একজন সৈনিক এগিয়ে এলো। সে সু-কে দেখা মাত্রই বলল—ও এ যে সু!

—তুমি ওকে চেনো নাকি?

-হ্যাঁ, চিনি। ও একজন খাঁটি ভিয়েৎকঙ।

একটা উৎকট চিৎকার করে সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট সু-র জামাটা ধরে টানলেন, তারপর ওর গালটা নেড়ে বললেন—কি, তোমার নাম সু নাকি?

--হ্যাঁ।

--তোমার সঙ্গে কে ছিল?

—অনেকেই। ওরা এতক্ষণে গুহায় পৌঁছে গেছে।

—জল নিয়ে?

—নিশ্চয়ই।

অফিসার হেসে উঠলেন—গুড, ভেরীগুড! এ কথার অর্থ না

বুঝে সু তাঁর মুখের দিকে তাকায়। লোকটি সু-র ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কি আছে দেখতে দেখতে বলেন—জানো আমরা জলে বিষ মিশিয়ে দিয়েছি।

সু দীর্ঘশ্বাস ফেলে। স্বাভাবিক প্রবণতায় সে গুহার দিকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তা হয় না, একজন সৈনিক ওর চুল ধরে টেনে রাখে।

অফিসার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলেন—পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। তোমার কমরেডরা সব মরবে। অল রাইট, চলো আমরা যাই। ওটাকে নিয়ে চলো।

সু-কে সেনারা টেনে নিয়ে চলে। তার মাথার চুল প্রায় পায়ের গোড়ালি ছুঁয়েছে। সে প্রাণপণে চেষ্টা করে বাধা দেওয়ার। হোন দাৎ পর্বত থেকে সরে আসা প্রতিটি পদক্ষেপ যেন লোহার মত ভারী। সু-র ইচ্ছা করে চিৎকার করে বলে -নাম-নো যে জল নিয়ে গেছে তা যেন কেউ পান না করে। কিন্তু সে উপক্রম করতেই সেনারা হাতচাপা দেয় ওর মুখে। সু তাদের গায়ে থুতু ফেলে বলে—যত সব বর্বর! কাপুরুষ!

সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট তাঁর বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ওর পিঠে আঘাত করলেন। সু মাটিতে পড়ে গেল। অফিসার ওর মুখে টর্চ ফেলে দেখে বললেন- তুমি না ভিয়েৎকঙ! তারপর ব্যঙ্গ করে বলেন—কি রকম ভিয়েৎকঙ। একটু বন্দুকের কুঁদো গায়ে লাগতেই কাঁদছ।

সু তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়—মূর্খ! তোমার বন্দুক আমার কিছু করতে পারবে না। আমি কাঁদছি আমার আপনজনের জন্য।

স্যাম যখন শুনলো যে সু ধরা পড়েছে তখন তার আর আনন্দের সীমা রইল না। সে ধীরে ধীরে তার ডান হাতখানা ধরে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে; তারপর বাইরে যায়।

রেনজাররা অপর তীর থেকে ফিরেছে নদী অতিক্রম করে। পথে ওরা সু-কে পাকড়াও করেছে। সু ইতিমধ্যে পথে কয়েকবার পড়ে

গেছে। হাঁটু-ভোর জল। খালি পা। জলের ওপর ভাসতে ভাসতে এসেছে। তীরে পৌঁছে সে সেনাদের ভালো করে দেখে নেয়। তারা ওর মুখের ওপর তীব্র আলো ফেলেছে। এমন সময় সু দেখল স্যামকে। নিস্পন্দ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। ডান হাতটা একটা কাপড়ে বাঁধা ঝুলছে। ওর সামনে দিয়ে সু চলে যায়। যেন ওকে চেনে না, এমনই পুতুলের ভঙ্গীতে হাঁটে। একটু যাওয়ার পর স্যাম চেঁচিয়ে ওঠে—হলট্ ইউ বীচ। দাঁড়া—কুত্তি, দাঁড়া!

সু মুখ না ফিরিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে। স্যাম ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে—কি, আমাকে চিনিস না?

সু উদ্ধত ভঙ্গীতে ওর দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

স্যাম অবশেষে বলে - ভেবেছিলাম তুই মাগী চিরদিন ঐ গুহাতেই থাকবি। কিন্তু ভদ্রমহোদয় বা ভদ্রমহিলাগণ তৃষ্ণার্ত, তাই তোমার সঙ্গে দেখা হল। একবার তোকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, তুই আবার ভিয়েৎকঙ দলে ভিড়েছিস?

—আপনিও তো সেই একই রকম আছেন।

—কথার জবাব দে!

—তুমি সেই আছো। একজন লেফটেন্যান্টের মুখের কথা এত নোংরা হয়! লোকে যে বলে গুণ্ডার দলের সর্দার ঠিকই বলে।

এই অপমানে স্যামের মুখটা লাল হয়ে উঠল। সে তার তরোয়াল খাপ থেকে তুলে নেয়। ওর চোখের ওপর সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ রেখে আবার খাপে পুরে বলে—ওখানে ঐ পোস্টে ওকে বেশ করে বাঁধো।

রেনজাররা ছুটল একটা খোঁটা খুঁজতে। তারপর নদীর পাশে সেটা পুঁতে তার সঙ্গে সু-কে বেশ করে বাঁধে।

স্যাম মেয়েটার সামনে দাঁতে দাঁত ঘষে ঘোরাফেরা করে।

—আজ এখনই তোর পেটটা কেটে দেখতুম তোর লিভারটা কত

বড়। কিন্তু তা করবো না। আর দু চারদিন থাক, তোদের আর সব লোকজনের সঙ্গে একসঙ্গেই কবরে যাবি।

এই বলে সে শিবিরের ভিতর ঢুকে গেল।

সেনারা যে দড়ি দিয়ে ওকে বাঁধা হয়েছে সেটা ভালো করে দেখে নিয়ে চলে গেল। একজন মাত্র লোক স্যামের শিবিরের সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

নাইলনের দড়ি ওর অঙ্গে ক্রমশঃই বেশী করে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। রাত ক্রমশঃ পাতলা হয়ে আসে, চন্দ্রোদয় ঘোষিত হচ্ছে। এখান থেকে সু সমুদ্র দেখতে পাচ্ছে। একটু আগে কিন্তু সমুদ্র দেখাই যাচ্ছিল না।

ক্রমে চাঁদ উঠল।...

পরিষ্কার শান্ত আকাশ। সমুদ্রের সেই চিরন্তন অভিযোগ। সেই দুঃসহ জ্বালার আর্তনাদ। হাওয়ায় হাওয়ায় সু-র মাথার চুল ও জামা শুকিয়ে গেল।

সু হোন দাং পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ভাবে, কি হচ্ছে ওখানে? হয়ত বিষক্রিয়ায় সবাই মরে গেছে এতক্ষণে। সবাই তৃষ্ণায় ছটফট করছিল হয়তো, নাম-নো জল আনতেই সব খেয়েছে। কি করে জানবে, জলে বিষ দেওয়া। স্বামীর কথা মনে পড়ে। সু আপন মনে বলে ওঠে—"সান, আমার প্রিয়তম সান, তুমি কি জানো আমাদের শত্রুরা কত ঘৃণিত। কত বর্বর।"

এই চাঁদের আলোয় স্বামীকে বেশী করে মনে পড়ে। এইখানে একবার স্বামী তার মাথা ধুতে সাহায্য করেছিল। তারপর নিজের হাতে চুল আঁচড়ে দিয়েছে।

সে সুখের স্বাদ গ্রহণ করেছে অঞ্জলি ভরে। আর এখন ওকে ওরা এমন জোরে বেঁধেছে যে হাতের আর সাড় নেই। বাঁদিকের পাঁজরাটা কন্ কন্ করছে। লেফটেন্যান্ট বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মেরেছে। কিন্তু এসব কিছু নয়। জ্বালা দিচ্ছে তার উদ্বেগ। কি

হলো কমরেডদের ? কি হল তার বোনটির ? কি হল তার নয়নমণি থুয়ার ?

সারা রাত চোখ খুলেই রইল সু। চাঁদ ক্রমশঃ ওপর আকাশে উঠে আবার ধীরে ধীরে অস্তে চলে গেল--কিন্তু সু-র উদ্বেগ একটি মুহূর্তের জন্যও কাটল না।

ভোরের দিকে শ্রান্ত অবসন্ন সু-র মাথাটা হেলে পড়ল। ওদিকে নদীজল মর্মরিত, আর সমুদ্রের হাওয়ায় ওর মাথায় চুল উড়ছে—যেন সাগর তরঙ্গ। সু একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

যখন ঘুম ভাঙলো তখন দিনের আলো ফুটেছে। সেনারা শিবির থেকে বেরিয়ে সমুদ্রতীরে ছাড়য়ে পড়ছে। স্যাম দুজন ইয়াঙ্কি অফিসার সঙ্গে নিয়ে এল। ওরা সু-র মুখের দিকে তাকিয়ে ইংরাজীতে বলে ঃ

—এই ভিয়েৎকঙ মেয়েটা সুন্দরী। চোখের ঐ উদ্দাম ভঙ্গী সত্ত্বেও সুন্দরী।

অপরজন বলে —চমৎকার বটে !

সেনারা সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সু-র দিকে আর বেশী না তাকিয়ে ইয়াঙ্কিরাও জলে গিযে পড়ে।

স্যামও যাচ্ছিল, ফিরে এসে বলল--ধৈর্য ধরো সুন্দরী। আজ তোমাদের গুহাবাসী র সব এখানে নিয়ে আসব।

স্যামও সমুদ্রতীরে গেল। ওর হাতটা সেইভাবে ঝুলছে। একজন সৈনিক ওকে কাঁধে করে নিয়ে যায়।

সবাই চলে গেল। দু চারজন রইল রান্না-বান্নার কাজে। তারা মাঝে মাঝে ওর দিকে আড়ে আড়ে চায় আব বলে - আমাদের অদৃষ্টে এ সব নেই রে।

--মেয়েটা আবার ভিয়েৎকঙ।

সু-র রাগ হয় আবার হাসিও পায়। নীরবে সে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। দিনের তাপ বাড়ছে।

আজ এই সকালের মত আর কোনো দিন হোন দাং-এর জন্য ওর মন এত আকুল হয়ে ওঠেনি। সে এখন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।

সহসা গুহার কাছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। অটোমেটিক পিস্তল, টমসন, ছোট-বোমা, রাইফেল ইত্যাদির ঐকতান সুরু হয়েছে। এরা সু-র আপনজন, কমরেডদের গুলিগোলার আওয়াজ যেন পরিচিত বাঁশীর সুর। সু আনন্দে আপন মনে চেঁচিয়ে ওঠে—ওরা আছে, ওরা বেঁচে আছে। লড়াই করছে।

একজন তাঁবেদার সেনা বলে ওঠে—হারামজাদাদের গুলির আঘাতে আমাদের এখনই স্ট্রেচার নিতে হবে।

-তবে যে জলে বিষ দেওয়া হয়েছিল? আরেকজন প্রশ্ন করে।

আরে, এত বড় নদী, সব জলটায় বিষ দিতে পারা সহজ নাকি? সহসা সু-র কথা মনে হতে একজন বলে ওঠে—যাই হোক, তোমার কোনো আশা নেই ধনী। তুমি এখন বঁটির সামনের মাছ।

সে ওর দিকে তাকায়। জবাব দেওয়ার ইচ্ছা হলেও চেপে যায়। তার আনন্দ হয়েছে। নিজের জন্য নয়, দলবলের জন্য। স্যাম বলেছিল ওদের টেনে আনবে এইখানে। কিন্তু অত সহজ নয়, ওরা লড়ছে।

সহসা গুলি-গোলা বন্ধ হয়ে গেল। একটা এম-জি-তে সুদূরবাহী গোলা ছোঁড়া হল। শত্রু দলের একজন বলে ঠিক কালকের মতন অবস্থা।

আবার গুলি গোলার আওয়াজ। সু দেখল একদল সেনা নারকেলকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এল। তারা স্ট্রেচারে করে দু চারজনকে নিয়ে আসছে।

সু-র কাছে যে সেনাটা ছিল সে বলে—কি হল! বলেছিলাম ত কাল। লোকটা কে হে।

কোনো উত্তর নেই। স্ট্রেচার বাহকরা সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। ওরা স্ট্রেচারগুলি বালির ওপর নামায়। আহতদের ভিতর

একজন আমেরিকান। পা ছুঁড়ছে আর চীৎকার করছে। বাহকরা কপালের ঘাম মুছছে।

একজন বলল– লেফটেন্যান্ট বলেছিল গুহায় ওরা সব বিষাক্ত জল খেয়ে মরে আছে. গুহায় ঢুকে পড়ো। কি হল? তিনটে মরেছে, পাঁচটা আহত। এই ইয়াঙ্কিটা এখনই ত ওর চোদ্দপুরুষের ঠিকানায় চলে যাবে।

—কিরে! ইয়াঙ্কিটাও গুহায় গিয়েছিল?

—না-না, একটা গুলি ছিটকে এসেছে।

গোলাগুলি থামল। সু বোঝে এইবার ভীষণ একটা কিছু ঘটবে। যাই হোক, সে সাহসে ভর করে থাকে। যা হয় হবে। ওর স্বামীর কণ্ঠস্বর যেন স্পষ্ট শুনতে পায়—আমরা কখনোই ছোট হবো না, কেন মা সেই অবস্থাই বেদনাদায়ক।

সানকে জবাব দেবার জন্যই বিড়বিড় করে বলে সু—তুমি যা বলেছ আমি তাই করব! আর তোমাকে দেখতে পাবো না। তুমি ফিরে এসে দুঃখ করো না। আমি তোমাকে ভালোবাসি প্রিয়তম। আমাকে না দেখে তোমার মন খারাপ হবে- তার জন্য রাগ করো না। আমি ক্ষমা চাই। থুয়ার কি হবে জানি না। তবে সে এখনও বেঁচে আছে আমি জানি– আমাদের কমরেডরা এখনও আছে, ওদের হাতে বন্দুক আছে।

সান-এর সঙ্গে কথা বলতে মনে হয় সে যেন ওর পাশটিতেই দাঁড়িয়ে আছে। তারপর মা ও বোনটির কথা মনে পড়ে।

সু যা ভেবেছিল তাই হল। যখন সে থুয়া মা আর বোনের কথা ভাবছিল তখন একজন সৈনিক ছুটে এসে ওর দড়িদড়া খুলে দিয়ে বলে —উঠে দাঁড়াও।

সু চেষ্টা করে পারে না। ওর হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে। সৈনিক ওকে রাস্তার ওপর টেনে আনে। নদীর জলের কাছে

পৌঁছে সু বলে, আমাকে নিজেই যেতে দাও। আমি যেতে পারব।

কিন্তু জলের ভিতর হাঁটতে ভীষণ কষ্ট হতে থাকে। সৈনিক প্রশ্ন করে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে জানো।

—না।

—কম্যাণ্ডাব হুকুম দিয়েছেন তোমাকে গুহার কাছে নিয়ে যেতে।

নারকেলকুঞ্জের কাছে গিয়ে ওরা সুকে কম্যাণ্ডারের সামনে দাঁড় করায়।

সু মনে মনে ভাবে—আমাকে নিয়ে কি করবে ওরা? নিশ্চয়ই কোনো কিছু কায়দা আছে। যাই করুক, আমার কোনো ভাবান্তব হবে না।

কম্যাণ্ডার সু-কে দেখে আবার গম্ভীর হয়ে পড়েন। ওকে আপাদমস্তক দেখলেন, তাবপর নিজের মাথায় বেটনটা ছপছপ করলেন। তাবপর একটু নোংরা হাসি হেসে বলেন—কি? এমন সুন্দর মুখ নিয়ে তুমি কি করে ভিয়েৎকঙদের সঙ্গে মিশেছ?

সু মুখ ফেরায়।

-তোমার স্বামী উত্তরে আছেন না? আমি সব জানি, দেখছ। তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে তুমি কিছুতেই রাজী হওনি। বেশ, খুব ভালো। সতী স্ত্রী।

সু নীরব। কম্যাণ্ডার বলতে থাকেন, স্পষ্টত আনন্দভরে স্বামীকে অস্বীকার করতে রাজী হওনি সে কারণে আমি তোমাকে তিরস্কার করি না। বরং অভিনন্দিত করি। তবে এই ভিয়েৎকঙদের সঙ্গে মেশামেশিটাকে ভালো বলি না। এ একেবারে আত্মহত্যার সামিল।

সু হাসে। তার অর্থ—এছাড়া তোমার আর কি বলার আছে? কম্যাণ্ডার তাকে জাতীয় সরকারের কথা, না গো দিন দিয়েমের যে জাতীয় সরকাবের তাঁরা প্রতিনিধি তার কথা বললেন। আমরা যতক্ষণ আছি উত্তর আর দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মিলন হবে না।

সু এতক্ষণে কথা বলে—এটা আপনার আর মার্কিন সরকারের ধারণা। আমরা ভিয়েৎনামবাসীরা চাই যে আমাদের দেশ সংযুক্ত হোক। তোমাদের মুছে ফেলতে চাই।

কম্যাণ্ডার হেসে ওঠেন—আমাদের মুছে দিয়ে? তোমার দলবল কালই এখানে মাথা নত করে আসবে। এইসব লোক তাদের দেশী বন্দুক দিয়ে আমাদের উড়িয়ে দেবে, না? তারপর প্রশ্ন করেন—মাইক্রোফোন ঠিক হয়েছে?

—হ্যাঁ, হুজুর!

অঙ্গভঙ্গী করে বলে ওঠে কম্যাণ্ডার ওকে টেনে নিয়ে যাও।

স্যামের দলবল সু-কে টেনে নিয়ে চলে, পিছনে পিছনে চলল স্যাম আর কম্যাণ্ডার। সাইকোলজিক্যাল সার্ভিসের একজন তরুণ সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্টও সেইখানে হাজির। লোকটির মুখটা ফোলা ফোলা, তারই হাতে মাইক্রোফোন।

কম্যাণ্ডার সু-র সামনে এগিয়ে এসে বলেন এসো, তোমার সঙ্গে একটা সন্ধি করি। জীবনের মূল্য বোঝো? বেশ, আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে ছেড়ে দেব। নইলে, তোমাকে তো চোখের পলকেই কেটে ফেলতে পারি। এখন বল দেখি চটপট। সু বলে—কে আর মরতে চায়? আমিই বা কেন মরতে চাইব?

কম্যাণ্ডারের মুখে হাসি ফুটে ওঠে - বাঃ তুমিও বাঁচতে চাও, তাহলে? এরপর কম্যাণ্ডার গুহার দিকে বেটন উঁচিয়ে বলেন বেশ, তাহলে তুমি মাইক্রোফোনে বল যে আমি আত্মসমর্পণ করেছি, তোমরাও আত্মসমর্পণ করো, আরে তাতেই ভালো হবে সকলের। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ঐ ঘুঘুর বাসা ত্যাগ করে যে চলে আসবে এবং অস্ত্র সমর্পণ করবে, তাকেও তোমার মত ছেড়ে দেবো। কেমন?

কম্যাণ্ডার এই কথা বলে থামলেন। ওর জবাবের অপেক্ষায় রইলেন। মাইক্রোফোন-ওলা লোকটি ওর সামনে মাইক ধরে। কম্যাণ্ডার সুকে লক্ষ্য করছেন। উনি বুঝেছেন নিশ্চিত মৃত্যুর

সামনে মেয়েটা নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণ করবে। এমন চমৎকার মেয়ে কি মরতে চায় সহজে !

সু কিন্তু নিশ্চল, নিশ্চুপ। মাইকের দিকে তাকিয়ে আছে। ছোট্ট মুঠির মত যন্ত্র, তাতে মৌচাকের মত অজস্র ছিদ্র। ও বোঝে, কমরেডরা তো কয়েক পা পরেই গুহার প্রবেশ-মুখে আছে। ওর কথা শুনতে পাবে সবাই—।

কম্যাণ্ডার অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে বলে—হাঁ কি না ? আমাদের অত সময় নেই।

সু এগিয়ে এসে বলে—বেশ ! আমি মাইকে কথা বলব।

গুহার ভিতর কথাবার্তা হচ্ছিল। আরেকটি আক্রমণের জন্য সবাই প্রতীক্ষারত। এর আগে একটি শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করা হয়েছে, তারপর আর কিছু হয়নি। সেনারা নারকেলকুঞ্জে যাতায়াত করছে, এখান থেকে দেখা যায়। সকলের হাতেই অস্ত্র। সবাই সতর্ক।

নাগান হাই থেপকে বলে—সুকে হয় ওরা গ্রেপ্তার করেছে নয় গুলি করে মেরেছে।

—সম্ভবত গ্রেপ্তার করেছে। গত রাতে কোনো গুলির আওয়াজ শুনিনি।

এরপর হাই থেপ চুপ করে থাকে। গতরাত থেকে তাকে অনেক অপ্রত্যাশিত সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রথমত নাম-নো ফিরে এসে অবধি ধনুষ্টঙ্কারের মত হাত-পা খিঁচ্ছে আর ক্রমশ শাদা হয়ে যাচ্ছে দেখে সহসা হাই থেপের সন্দেহ হয়। ওকে প্রশ্ন করে জানা যায় সে দু-এক আঁজলা জল খেয়েছিল নদী থেকে। এই কথা বলে নাম নো মাটিতে পড়ে গেল। হাই থেপ তখন গলায় আঙুল দিয়ে বমি করিয়ে দিলেন। একটা হলদে রঙের তরল পদার্থ বেরিয়ে এল। নদীর জলে বিষ মেশানো হয়েছে একথা বুঝতে আর বাকী রইল না। এই বমি করেই নাম নো

বেঁচে গেল। একঘণ্টা পরেই সে খাড়া হল। তখনই সব জল ফেলে দেওয়া হল। তারপর সু-র অদৃশ্য হওয়ায় কেউ সারারাত ঘুমোতে পারেনি। মধ্যরাত্রে থুয়া উঠে কাঁদতে থাকে মা -মা। এরপরও যখন মা শান্ত করতে এলো না প্রতিদিনের মত, তখন সে কেঁদে আকুল হল। কোয়েন তাকে কোলে করে থামায়। সকালেও মাকে না দেখে সে আরো কাঁদতে থাকে। কোয়েন তাকে বুঝিয়েছে সু গ্রামে গিয়েছে।

সু-র এই নিরুদ্দেশ সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। বা রেন আর ট্রং গুহায় এসে সু-কে পাওয়া যাচ্ছে না দেখে তখনই আবার বেরিয়ে গেছে, সারা ঝোপঝাড় খুঁজেছে। কোথাও পায়নি তাকে। নাগানও চেষ্টা করেছে। সারারাত তাই উদ্বেগে কেটেছে। সবাই নিজেকে অপরাধী মনে করেছে। সহস্র অনুশোচনায় সবাই আকুল হয়ে উঠেছে। সু-র মধুর ব্যবহার সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। নদী, গাছপালা, ফুল-ফলের মত সেও হোন-দাৎ-এর একটি অংশ।

হাই থেপ বুক চাপড়ে বলে—এ আমারই দোষ। আমিই দায়ী। এমন সময় গুহার স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মাইকের আওয়াজ শোনা যায়—হ্যালো, হ্যালো, হিয়ার দিস! শোনো আমাদের ঘোষণা শোনো।

গুহার ভিতর অখণ্ড স্তব্ধতা!

—হ্যালো, রিপাবলিকান আমি ঘোষণা করছি। ভিয়েতকঙের যারা গুহায় আছো তাদের উদ্দেশ্যে। তোমাদের একজন নাগুয়েন থি সু আমাদের হাতে এসেছে। সে ন্যাশন্যাল গভর্ণমেণ্টের ন্যায়সঙ্গত নীতির সমর্থনে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সে এখন কিছু বলবে— !

কণ্ঠস্বর থামল। লাউড স্পীকারের কড়্ কড়্ কড়্ ধ্বনি! গুহায় সবাই একেবারে ভ্যাবাচাকা। একি শুনল তারা? এ যে নিজের কানকেই বিশ্বাস করা যায় না।

হাই থেপ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বাইরে তাকায়।—ভাবে শত্রুদল সু-কে দিয়ে জোর করে এসব করেছে। কিন্তু বিশ্বাস করা যায় না। তবে বলাও যায় না, ওর মেয়ে আছে, মা আছে, জীবনের অন্য সব বাঁধন আছে। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকতা, এই ঘৃণ্য কাজ সু করবে? ওকে সবাই ভালোবাসে। ওর কথায় সকলেরই মনোবল ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

এমন সময় মাইকে শোনা গেল—অ্যাটেনশান। গুহাবাসীরা শোনো। এখন নাগুয়েন থি সু কথা বলবেন- ।

সবাই বাইরের দিকে চায়। সু র পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়

—কমরেডস! এই আমি সু কথা বলছি। কমরেডবৃন্দ ওদের কথা বিশ্বাস কোরো না। সব মিথ্যা। আমি কখনই আত্মসমর্পণ করবো না। জল কেউ যেন খেয়ো না। জলে বিষ আছে। তোমরা অস্ত্র ত্যাগ কোরো না। সবাই ভালো তো! আমার মেয়ে কি বেঁচে আছে? যদি তাই হয়, একটা গুলির আওয়াজ করো, আমি বুঝে নেব। একটা শব্দ—তারপর এই মধুর কণ্ঠস্বর বন্ধ হল।

আর গুহার ভিতর সবাই উঠে দাঁড়ায়। সকলের চোখে জল!

একদিকে গুহার বাইরে কম্যাণ্ডারের মুখ শুকিয়ে আমস হয়ে গেছে। স্যাম এক লাথি মেরে সু-কে মাটিতে ফেলে থেঁতলেছে। কিন্তু বা রেনের বন্দুকের আওয়াজ তাকে তৃপ্তি দিয়েছে। থুয়া বেঁচে আছে। সবাই বেঁচে আছে।

কম্যাণ্ডার হুকুম দিলেন -ওকে ফাঁসিতে লট্‌কে দাও। ঐ নারকেল গাছে ঝুলিয়ে দাও, ওর ভালোবাসার লোকজন দেখুক।

রেনজারসরা সু-র ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা নারকেল গাছ একটু বেঁকে ঝুঁকেছিল গুহার দিকে। কম্যাণ্ডার বললেন- ঐখানেই ওকে ঝুলিয়ে দাও।

সু-কে মাটি থেকে ওঠানো হল। তার মুখখানি সুন্দর দেখাচ্ছে।

ওর হাত দুটি কি সুন্দর। এই হাত দিয়ে একদিন স্বামীকে আলিঙ্গন করেছে, মেয়েকে কোলে করেছে, বোনকে আদর করেছে, কত আত্মীয় বন্ধুকে সেবা করেছে। আজ সেই হাত দুমড়ে কি হয়ে গেল। তবু তার এতটুকু কাতরতা নেই।

ওরা দড়ি ধরে টানছে। সু অচল অটল। সুকে গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে কম্যাণ্ডার আদেশ দিলেন - ঐভাবেই ঝুলুক। ওর ভিয়েৎকঙ বন্ধুরা গুহার ভিতর থেকে ওর গোঙানি শুনুক।

গুহার ভিতর সবাই নীরব। সবাই বোঝে যে বীর রমণী সু আর নেই। এই প্রথম ওদের জীবনে যেন অন্ধকার নেমে এসেছে। এই যেন চূড়ান্ত ক্ষতি। শোক আর ঘৃণায় সবাই মুহ্যমান হয়ে পড়ে থাকে।

কোয়েন কাঁদছে। তার কোলে থুয়া। আর কোনোদিন মাকে দেখবে না।

কিসের একটা আওয়াজ শুনে থুয়াকে বসিয়ে রেখে কোয়েন গুহামুখে এগিয়ে গেল। নাগান ওকে দেখে শুকনো গলায় বলে—ওরা ঘোষণা করলে, সু-র ফাঁসী হয়েছে। আমাদের সবাইকে আত্মসমর্পণ করতে বলেছে।

এমন সময় হাই থেপ এসে বললেন—আমাদের এ লড়াই সকলের লড়াই। এই লড়াই-এর খাতিরে আমার বিনা আদেশে কেউ কোথাও যাবে না।…সু-র মৃত্যুর শোধ নিতে আমরা যে যার কাজে হাজির থাকব। জয় আমাদের হবেই। এ লড়াই আমাদের জয় ঘোষণা করবে। কেঁদো না কোয়েন, থুয়াকে দেখো। দুঃখ নয়, শোক নয়, ভেঙে টুকরো টুকরো হলে চলবে না।

এ লড়াই জিততে হবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

এক

কারো মুখে কথা নেই—

পুরুষরা সবাই নীরবে যে যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কোয়েন কোনমতে আপনাকে সামলে নিয়েছে। তার চোখে আর জল নেই। সংযত কোয়েনের পিঠে হাত রেখে হাই থেপ বলে—লক্ষ্মী বোনটি, আর কেঁদো না। থুয়ান সঙ্গে তুমি যাও। নিজেকে এভাবে আর টুকরো টুকরো কোরো না।

অলস গতিতে কোয়েন চলে যায়, হাতের নখগুলি সে দাঁত দিয়ে কাটছে। হাই থেপ তার পাথরের ওপর বসে আছে। মুখের ওপর গজিয়ে ওঠা কদিনের দাড়িতে হাত বুলোচ্ছে এবং শাদা গলায় বলল।

—আমাদের গুহার সামনে মাইক বসিয়ে ওরা মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে লড়াই সুরু করল, আমাদের মনোবল ভেঙে দিতে চায়। কি আশ্চর্য! ওদেরই যন্ত্র ব্যবহার করে সু আমাদের সঙ্গে কথা বলল—ওদের খেলা উলটে দিল। মেয়েটা অপূর্ব সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। সু ভেবেছে আমরা জানি না জলে বিষ মেশানো আছে. তাই ও আমাদের সতর্ক করে দিয়েছে।

কমরেডবৃন্দ! লক্ষ্য করো সে আমাদের শেষ অনুরোধ জানিয়েছে আমরা যেন হাতিয়ার না ত্যাগ করি, কখনই যেন আমরা ভেঙে না পড়ি—

বারেন গর্জন করে বলে ওঠে—কখনই নয়, এক আমরা সবাই যদি মরে যাই, সে অন্য কথা।

তু নঘিয়েপ মুখ কালো করে বলে—তাহলে তোমার অনুমান মাফিক আমাদের সকলের গণমৃত্যুটা ঘটছে কবে? আমার যদি

একটা পাঁজরাও থাকে তাহলে সেটাও যুদ্ধে লাগাব। আমাদের গোলাবারুদ সব নষ্ট করব তবু ওদের হাতে দেবনা।

দাং সোৎসাহে বলে—ঠিক ঠিক। খুড়ো তুমিও যা করবে আমিও তাই করব। কিন্তু খুড়ো তার আগে একটুখানি জল দিতে পারো। তেষ্টায় যে মবে গেলুম, কি ভীষণ তেষ্টারে বাবা!

আলোচনার মোড় ফিরে যেতে পুরুষরা সবাই সকৃতজ্ঞ ভঙ্গীতে দাং-এর দিকে তাকাল।

দাং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তু নঘিয়েপের দিকে তাকিয়ে একটু 'কূটনৈতিক' চালে হাসল।

তু নঘিয়েপ বলল কিন্তু বাবাজী তোমার জল খাওয়া ত নয়, একেবারে মোষের মত জলপান, এই বলে নিজের জলপাত্রটি তরুণ দাং-এর দিকে এগিয়ে দেয়।

দাং প্রাপ্তি মাত্রেই তৎক্ষণাৎ তা এক চুমুকে শেষ করার চেষ্টা করে—কিন্তু তা থেকে একটি ফোঁটাও জল বেরোল না। সে বলল—খুড়ো একি রসিকতা! কিন্তু যেন একপেট জল খেয়েছে এইভাবে পাত্রটি তোয়ের হাতে তুলে দেয়, এই নাও, একফোঁটা টেনে নাও, গলাটা পরিষ্কার হবে।

তোয় জলপাত্রটি হাতে নিয়ে ঠোঁট দিয়ে চাটে, দাং হেসেই খুন। তোয় এইভাবে ঠকে গিয়ে রেগে জলপাত্রটি তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

তু নঘিয়েপ প্রাণভরে হেসে বলে—কি ভায়া তৃষ্ণা মিটেছে?

মাথায় বজ্রাঘাত পড়ুক, আমাদের ঠকিয়ে আবার তাই নিয়ে ঠাট্টা—!

তু নঘিয়েপ আরো জোরে হেসে ওঠে, আমি সকাল থেকেই তো তোমাদের বলছি যে আমার জলপাত্রে কিছুই নেই। তোমরাই তো স্যার…

বয়সে বড়ো হলেও তু নঘিয়েপ তাঁর চেয়ে কমবয়সী সব

কমরেডদের 'স্যার' বলে সম্বোধন করতেন। ইনি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের হোয়া হাও শ্রেণীর প্রবীণ সদস্য, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, দু বছর নিরামিষ আহার ছেড়েছেন। এখনও অবশ্য বুদ্ধ এবং স্বর্গলোক সম্পর্কে বিশ্বাসী, তবে রসিকতা করতে অদ্বিতীয়। আগের রাত থেকেই ওঁর জলপাত্র শূন্য। শেষ কয়েক ফোঁটা জল বী-কে দিয়েছিলেন।

গুহাতেও একবিন্দু পানীয় জল নেই, সকলেরই গলা শুকিয়ে কাঠ।

বা রেন বলে ওঠে– আমরা তো প্রস্রাব খেতে পারি। তাহলে কেমন হয়?

তু বলেন, একেবারে বীয়ারের মতো স্বাদ। জানো প্রতিরোধ আন্দোলনের যে সব কমরেড পৌলো কোনডোর থেকে পালাতে পেরেছিল তাদেরও ঐ অবস্থায় পড়তে হয়।

নাম তান মাথা নাড়ে, ও ধরনের বীয়ার আমার চলবে না ভাই তার চেয়ে বরং তেষ্টায় বুক ফেটে মরা ভালো।

বা রেন বলে ওঠে, তোমার আবার বাড়াবাড়ি। সকলকেই সব অবস্থার মধ্যে যেতে হয়, কখনো চড়াই কখনো উতরাই। এখন আর সে সময় নয় যে তোমার বউকে ডেকে হুকুম করবে--এক পেয়ালা চা এনে দাও।

সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ে। সেদিন অপরাহ্নে সকলেই কয়েক মুঠো করে খিচুড়ি খেয়েছে। বা রেন আর সইতে পারে না, সে তার জলপাত্রে প্রস্রাব করল, তারপর সেটি বেশ করে নাড়িয়ে সবাইকে আমন্ত্রণ জানায় একটু করে গ্রহণ করার জন্য। কেউ তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করার আগেই সে নিজে সেই পাত্রে চুমুক দেয়। একটু মুখে দিয়ে বলে, মন্দ নয়। একটু চেখে দেখ। একশ পারসেণ্ট গ্যারাণ্টি।

আরো সবাই ওর অনুকরণ করে। হাই থেপ এ সবই দেখছিল। ওদের বাধা দেওয়ার কথা মনে হলেও হাই থেপ মত পরিবর্তন করে।

সে নিজেই তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মারা যাচ্ছে, এই যে তৃষ্ণার জ্বালা এর মত আর কিছুই নেই।

অনেক অন্ধকারময় দিনে ঠিক নিজের প্রস্রাব পান না করলেও চারদিন অন্নজল স্পর্শ না করে শেষ পর্যন্ত একটা জ্যান্ত কাঁকড়া তৃপ্তি সহকারে গোগ্রাসে গিলেছে।

গভীর জঙ্গলে এক রাত্রে বারেন হাই থেপের গায়ে ছুরি বসিয়ে রক্ত বার করে দেয় বিশ্রী জ্বর উপশমের প্রয়োজনে। আলো ছিল না, বারেন তার সিগারেট লাইটার জ্বেলে কাজ সারে, কিন্তু তার পলতে ছিল না। তুলো পুড়িয়ে পলতের কাজ চালাতে হয়। যতবার আলো জ্বলে উঠেছে ততবার হাই থেপের পিছন দিকে ছুরি চালিয়ে ক্ষতটা টিপে টিপে রক্ত বার করেছে। এত সত্ত্বেও হাই থেপ সেরে উঠেছে।

ওরা সেই সময় শূকরদের খাদ্যও খেয়েছে। পায়ের দুটো বুড়ো আঙুল নষ্ট হওয়ায়, গ্রামে ফেরার সময় নদীর ওপর দিয়ে আসতে হয়েছে, পাছে পায়ের ছাপ দেখে ধরে ফেলে। জীবনে আরো অনেক রকম পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ওর চোখে তাই এইভাবে মূত্র পান এমন একটা গুরুতর ব্যাপার নয়। তবে কমরেডদের এই কষ্ট দেখে মনটা বেদনায় ভরে ওঠে।

সহসা মনে পড়ে পাহাড়ের এক জায়গায় একটা ছোট্ট নালার মত কি দেখেছিল। সে বলে ওঠে, দাঁড়াও দেখে আসি, কোথাও একটু জল পাই কিনা। বলা যায় না, পেতেও পারি।

গুহার ভিতর প্রবেশ করে হাতের ফ্ল্যাস লাইট জ্বেলে চারদিকে সন্ধান চালায়। অবশেষে দেখা গেল প্রায় দুটি হাত একত্র করলে যতটুকু স্থান হয় ততটুকু জায়গায় জল চিক্ চিক্ করছে। একটু জল তুলে নিয়ে নাকের কাছে ধরে। ।তা-পচা গন্ধ।

—দূর—ছাই। তবে একেবারে মারাত্মক নয়। আপন মনেই হাই থেপ বলে ওঠে।

হাই থেপ ভাবে নেই মামার চেয়ে কানা মামাই ভালো। তারপর যারা খুব বেশী তৃষ্ণাকাতর তাদের ডেকে পাঠায়। সবশুদ্ধ পাঁচজন। ওদের মধ্যে বা রেন আর তরুণ দিয়েপও আছে।

নাম তান এই দলে যোগ দিতে চাইল না। বলল আমার এই গৌরবে আর কাজ নেই। অমন নোঙরা জিনিস আমার সইবে না।

পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে হাই-থেপ সবাইকে হাত ধরে উঠিয়ে নেয়, আর এক হাতে সেই জল-নালিতে ফ্ল্যাস লাইট ধরে আছে।

বা রেন তরুণ দিয়েপের কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলে—এখন মন্ত্রী মশাই আপনিই প্রথম জল গ্রহণ করুন।

কফি রঙের সেই জল-নালার দিকে তাকিয়ে বেচারী দিয়েপ ইতস্তত: করে।

বা রেন আবার বলে ওঠে কি হল? চালিয়ে যাও। তোমার অসুখ করলে আমি দেখব। সাইগণের পান ভোজনের চেয়ে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম। যাও যাও তৃষ্ণা মিটিয়ে নাও। এই লড়াই এখন বেশ কিছুকাল চলবে, জেনে রাখো।

ম্লান হাসি হাসে ছাত্র দিযেপ, তারপর উপুড় হয়ে জল পানের উদ্যোগ করে।

কয়েক চুমুক পান করে উঠে দাঁড়িয়ে মুখ মুছে নেয়। দিয়েপ সবায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে।

বা রেন চোখ মিটকে বলে- কি গো কি হল?

না, মন্দ নয়।

- আমি বলেছিলাম। এইবার আমার পালা।

বা রেন দিয়েপের মত উপুড় হয়ে পড়ল। দুচুমুক পান করে সে পাশের লোকটিকে বলে এইবার তুমি।

সবাই এই ভাবে জল পান করে নিল। সামান্য জলাশয়

তৎক্ষণাৎ শূন্য হয়ে গেল। যখন হাই থেপের পালা হল তখন সামান্য কয়েক ফোঁটা জল আছে মাত্র। পাথরটাই চাটতে হয়।

হাই থেপ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। বিশ্বাসঘাতক বা ফিটা যেন কেশে উঠল। খুব কাছেই আছে।

বা রেন বলে ওদের বাঁচিয়ে রাখার অর্থ কি? ওরা আমাদের ভাগের ভাত আব জল ধ্বংস করছে। আমার হাতে ছেড়ে দাও আমি আজই রাতে ওদেব পূর্বপুরুষদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিই।

হাই থেপ বলে -ও প্রশ্ন ওঠে না। হুকুম না পেলে আমরা ওদের ফাঁসি দিতে পাবি না। সমস্ত জনতাকে উপস্থিত থাকতে হবে। তুমি বড়ো অসহিষ্ণু। ওই বিশ্বাসঘাতক চরকে শেষ করতে হলেও সমগ্র জনগণকে ডাকতে হবে। সবচেয়ে খারাপ কি জানো, এই জায়গাটায় ওদের রাখা ঠিক হয়নি। সব কথাই ওরা শুনছে। আজ রাতে ওদেব এখান থেকে সরিয়ে গুহায় শেষ প্রান্তে রেখে দেব।

বেশ! সেই ভালো।

গুহার প্রবেশ পথে পৌঁছে হাই থেপ নাগানকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলে আজ রাতে স্কাউটদের বাইরে পাঠিয়ে কিছু নারকেল নিয়ে আসতে হবে। তাতে তৃষ্ণা দূর হবে, আহারও মিলবে।

নাগান বলল টয় আর ট্র'কে নিয়ে আমিই যাবো।

হাই থেপ প্রশ্ন করে ওরা নারকেল গাছে চড়তে পারে?

—খুব ভালো পারে।

বেশ। তবে খুব সাবধান। প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক থাকবে। এখনও চাঁদের আলো আছে

কিছু ভেবো না, আমি পাহারা দেব।

নাগান বা রেনেব দিকে তাকিয়ে বলে দেখো আমরাই বা ফিকে ধরে এনেছি। সুতরাং ফাঁসি দেওয়ার দায়িত্ব আমাদেরই।

বা রেন মুখ গোমড়া করে বলে—তুমি কি করে কি করবে জানি না। তোমার হাত কাঁপবে না।

নাগান বলে—সে পাত্র আমি নই।

অতঃপর তরুণ নাগান টয় আর ট্রংকে খুঁজতে যায়।

তাড়াতাড়ি সবাই তৈরি হয়ে নেয়। কোমর পর্যন্ত আদুড় করে সার্টটা মাথায় বেঁধে নেয়। সকলের সঙ্গে শুধু হাফপ্যাণ্ট। কোমরে টমসন ক্লিপ আর গ্রেণেড। হাতে অটোমেটিক পিস্তল। সন্ধ্যার অন্ধকারের অপেক্ষায় ওরা বসে রইল।

গুহার সুমুখ দিয়ে যে পথটা চলে গেছে সেই পথ প্রতি মিনিটে কেমন একটু একটু করে অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে তা দেখছে নাগান। সূর্য অনেকক্ষণ অস্ত গেছে এখন দিনের আলো ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হচ্ছে।

নারিকেল কুঞ্জ থেকে একটা বিরাম বিহীন শব্দ ভেসে আসছে। তালগাছগুলির পাতা কেমন ঘন নীল হয়ে উঠছে আর সমুদ্রতরঙ্গের কলরোলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাছের পাতাগুলি মর মর শব্দে আন্দোলিত হচ্ছে।

সমগ্র নারিকেল কুঞ্জ একটা পাতলা কুয়াশায় ঢাকা। অগ্রসরমান রাত্রির অন্ধকারে পথরেখা মুছে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

শত্রুপক্ষ মাঝে মাঝে গুলি ছুড়ছে।

নাগান এখন সমুদ্র তরঙ্গের কলরোল আরো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

নাগানের মনে হল রাতের অন্ধকার ভূমির সব কলরবকে জোর করে দাবিয়ে দিয়ে সমুদ্রের কণ্ঠস্বরকে জোরদার করার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে।

লক্ষ লক্ষ সাগর তরঙ্গ সমুদ্রবেলায় আছড়িয়ে পড়ছে। সব সময়েই এই সাগর গর্জন মাটির বুকে সুতীব্র প্রতিবাদে মুখরিত।

গত কয় রাত্রি ধরে নাগান সাগর তরঙ্গের প্রতিধ্বনি কান পেতে শুনেছে। তার কাছে মনে হয়েছে এই সাগরকল্লোলে কোথায় যেন

একটা উষ্ণতার স্পর্শ আছে। গুহার প্রাচীরে সাগরের গর্জন ব্যহত হয়ে অনেকটা চাপা পড়েছে।

দ্বাদশ চান্দ্রমাসের আজ উনবিংশ দিবস। রাতটা তেমন অন্ধকার নয়। কিছুক্ষণ অন্ধকার থাকার পর আসন্ন চন্দ্রোদয়ের আভাষে আকাশের গা ফিকে হয়ে এসেছে। নাগান আবার পথ, আন্দোলিত নারকেল পাতা সব স্পষ্ট দেখতে পায়।

অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে নাগান উঠে পড়ে চুপি চুপি, বলে চ'লো এইবার যাওয়া যাক।

টয় আর ট্রং উঠে পড়ল। প্রবেশ পথে পৌঁছে ওরা থমকে দাঁড়ায় তারপর দ্রুতপায়ে এগিয়ে যায়।

বগলের নীচে অটোমেটিকটা চেপে নাগান একটু মাথা নীচু করে চলছে। তার বাঁ হাতটা সামনের দিকে প্রসারিত। সোজা রাস্তা ছেড়ে ওরা একটা চোরা রাস্তা ধরেছে আর তার ফলে ওরা তিনজনে বেশ সহজেই কোনো শত্রু সেনার সামনে না পড়ে নারিকেল কুঞ্জে পৌঁছে গেল।

সহসা নাগান কয়েকটা গুলির আওয়াজ শুনতে পায়। প্রথমটায় ভেবেছিল মামুলি গুলি ছোড়াছুড়ির ব্যাপার। তারপর কথাবার্তাও শোনা গেল। নাগান ওর সঙ্গীদের কানে কানে বলল- ওরা কিছু সন্দেহ করছে না, নাও আগে নারকেল পেড়ে ফেল আমরা যাওয়ার পথে কুড়িয়ে নেব।

বেশ তাই হোক।

টয় আর ট্রং দুটি ছোটগাছ নির্বাচন করে নেয়, গাছ দুটিতে ফল ভরে আছে। ওরা নাগানের হাতে যার যার বন্দুক দিয়ে দিল। নাগান বলল—একটা কাজ করবে, যে মুহূর্তে ওরা গুলি ছুঁড়বে ঠিক সেই সময়ে নারকেল পাড়বে। ওরা কিছু আওয়াজ টের পাবে না।

টয় মাথা নাড়ে। ওরা দুজনে গাছে উঠে পড়ে বেশ সতর্কভাবে ধীরে ধীরে উঠতে থাকে। এক লহমায় ওরা একেবারে ওপরে উঠে

পাতার আড়ালে হারিয়ে গেল এবং হাত দিয়ে নারকেল ভাঙতে শুরু করল। যেই গুলির আওয়াজ শোনা যায় ওরা তখনই ফল নীচে ফেলে দেয়।

নাগান নীচে দাঁড়িয়ে গাছের গুঁড়িতে আস্তে আস্তে চাপড় দেয়। টয় আর ট্রং ইসারা বুঝে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে। ওরা নামতেই নাগান ওদের হাতে বন্দুক তুলে দিয়ে নারিকেল কুঞ্জের গভীরে প্রবেশ করে।

কয়েক পা এগিয়েই ওরা থেমে দাঁড়ায়। নাগান কয়েকটা লাল আলো দেখতে পেয়েছে। খুবই সামান্য আলো। এর অর্থ শত্রু সেনারা ধুম পান করছে। থু দাউ মোট-এর কড়া তামাকের গন্ধ নাকে এসে লাগে।

নাগান আর তার সঙ্গীরা গাছের আড়ালে গিযে বসে, বন্দুকের নলটা অবশ্য থাকে শত্রুদের দিকে উঁচিয়ে।

ওরা এতটা কাছে আছে যে যখন সিগারেট টানছে তখন ওদের মুখটা দেখা যাচ্ছে—মুখগুলি এক একবার জ্বলে উঠছে আবার নিভে যাচ্ছে।

একজন সৈনিক বলে উঠল—সন্ অব এ বীচ। গুহার দোর গোড়ায় কাপ্তেনের মৃত্যুর দৃশ্য সারা শরীর বরফ করে দেয়। আর ভেবে দেখ অন্ততঃ একহাজার গ্রেনেড ওখানে ছোঁড়া হয়েছে।

হাঁ, ব্যাপারটি কি যেন- ব্যাপারটা যত প্রলম্বিত হয় ততই ওর মজাটা হ্রাস পায়। ওরা সবাই নিশ্চিতভাবে জানে যে গুহায় ওদের জীবন চড়া মূল্যে বিকাবে। চারদিন--আর এর মধ্যে ওরা আমাদের প্রায় একশ জনকে খতম করেছে।

আর আমরা, একজন মাত্র স্ত্রীলোককে পাকড়াও করেছি। কম্যাণ্ডার যা কিছু করার ছিল সব অস্ত্রই প্রয়োগ করেছে তবু মেয়েটাকে সায়েস্তা করতে পারে নি। চমৎকার ব্যাপার। কে জানতো মেয়েটার এমন সাহস। কোথায় ওর সঙ্গীদের বলবে

আত্মসমর্পণ করো, তা নয় উলটে বলছে খবরদার কোনো মতে অস্ত্র ছেড়োনা।

কম্যাণ্ডার যখন ওকে নারকেল গাছে লটকে দিয়ে ওর মাকে ডেকে পাঠাল, তখন মাকে আসতে দেখে মেয়েটা কান্নায় ভেঙে পড়ল। কম্যাণ্ডার ভাবলেন এইবার বুঝি আত্মসমর্পণ করবে. তা নয় ওর হাতে মাইকটা দিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সত্যি কথা বলতে কি ভাই লেফটেন্যাণ্ট স্যাম যখন মেয়েটার মাথাটা কাটছিল তখন আমার লজ্জা করছিল। ভারী লজ্জা করছিল

--কি আর ভালোটা হল মেয়েটা তখনও মরেনি, অথচ চালাকী করতে গিয়ে নিজের ঘাটাই বেড়ে গেল। বেশ জবর রকম জখম হয়েছে শুনলাম।

শেষ হল কিনা কে জানে?

কিসের অবার শেষ?

-- কেন, ঐ মেয়েটার-- ?

হাঁ, মারা গেছে, সন্ধ্যার আগে মারা গেছে, কে একজন তো তাই বলল।

নাগান এই আলোচনাটুকু শুনে মাথা নীচু করে, তার গলায় কি একটি আটকেছে।

সেই সৈনিকটা আবার বলে -জানিস গাঁয়ের লোক জড়ো করে তো তাদের সামনে মেয়েটাকে মারা হল, মেয়েটা মরার সময় বলে গেল, তোমরা সব প্রতিশোধ নিয়ো— প্রেসিডেণ্ট হো-চি-মিনের জয়—

সৈনিকের কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে ওঠে।

আমি ভাই খালি এইটুকুই শুনেছি—কারণ ঠিক সেই সময় জনতা চেঁচিয়ে উঠল। একটা বুড়ি তো ছুরি নিয়ে লেফটেন্যাণ্টকে মারবার জন্য তেড়ে এল। রেনজারসরা ওকে গুলি করে মারার জন্য এগিয়ে যেতে লেফটেন্যাণ্ট স্যাম-ই বাধা দিল। স্ত্রীলোকটি নাকি ওরই মা,

আমিই তো ভীড়ের চাপে পড়ে গিয়েছিলাম, একটা মোটাসোটা মাগি আমার ওপর উঠে দাঁড়িয়েছিল। খুব বেঁচে গেছি বাবা।

অপর সৈনিকটি প্রশ্ন করে, তারপর কি হল ?

—আমি উঠে বসতে না বসতেই দেখি সেই জনতা দড়ি-দড়া কেটে দেহটাকে নিয়ে পালাচ্ছে—কম্যাণ্ডার হাঁকছেন, আমি তোদের সবাইকে গুলি করব, তোরা একজন ভিয়েৎকঙকে কবর দেওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছিস -

জনতাও তেমনি কড়া। কি বললে জানিস—ভিয়েৎকঙ-টং জানি না, ও আমাদেরই একজন তাই নিয়ে যাচ্ছি—এই বলে একেবারে অকুতোভয়ে নিয়ে চলে গেল।

কম্যাণ্ডার হার মানলেন। কি আর করবেন বল ? ওরা বন্দুকের গুলির ভয় না রেখে চলে গেল। জানো ভাই. গুলি করলে অনেকেই মরত. আমরা চুপচাপ রইলাম।

সৈনিকটা থামল। আবার একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে নীরবে ধূমপান করে। তারপর ওদের মধ্যে কেউ কেউ উঠে পড়ল। বলল চল, একটু জিরিয়ে নিই। গাঁয়ে গিয়ে একটু আরাম করি। একটা অন্ধ আশ্চর্য একতারা বাজায়।

নাগানের গা ঘেঁষেই প্রায় ওরা চলে গেল। ওরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে গাছের সঙ্গে গা লাগিয়ে পড়ে রইল।

দুজন সৈনিক কিন্তু থেকে গেল। ওদের মধ্যে একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—কে জানে কোথায় এইবার টেট পরব (বসন্ত উৎসব) কাটাব।

—দূর—ওরা আমাদের কা মাউ পর্যন্ত ঠেলে দিতে পারে।

—কাছে আর দূরে, তফাতটা কি ! এইখানেই যদি থাকি তাহলেই কি বাড়ির লোকজনের সঙ্গে পরব কাটাতে পারব ?

—যাই করিস ভাই ঐ মরণগুহায় যেন ঢুকে পড়িস নি। জানিস তো আহতদের উপযুক্ত আর শয্যা নেই।

—যদি হুকুম দেয় তো কি করবি বল? বলবি যাব না? জানিস কাল আমি স্কুলের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম সে যা যন্ত্রণা কাতর কান্না রে ভাই, শুনে বুক ফেটে যায়।

আমি কি করব জানিস, করপোরাল কো র কথাই শুনব।

কো? সে আবার কি বলেছে?

ওরা দুজনে গলার স্বর নামায়, মৃদু গলায় কি যে বলে বোঝা যায় না। গেরিলারা ওদের কথা শুনতে পায় না।

নাগান পা দিয়ে সঙ্গীদের অঙ্গ স্পর্শ করে ইঙ্গিত করে, তারা উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আগে পাড়া নারকেলগুলি কুড়িয়ে নেয়।

নারকেলের কাঁদিগুলি গলায় ঝুলিয়ে ওরা সবাই চলতে থাকে।

সারা পথ শোকাচ্ছন্ন নাগান খালি ভাবে - সু আর নেই। সু-র মৃত্যুই হয়েছে।

একটা তীক্ষ্ণ বিষাদময় জ্বালায় ওর সারা দেহ মন ভরে যায় নারকেলের কাঁদির ভার গলায় পাথরের মত ভারী মনে হয়।

বা ফি আর তার স্ত্রী যেখানে বসে অদৃষ্টের কথা ভাবছে সেখানে আলো প্রবেশ করে না। দিন-রাত সমান অন্ধকার। দিনে একবার কোয়েন বা নাম নো শত্রুপক্ষের এই চরদের কিছু ভাত আর জল এনে দেয়। সেদিন কোয়েন বলল, আমাদের এখন জলের অভাব।

কোয়েন চলে যেতেই বা ফি বলল, ওদের নাকি জল নেই। নিশ্চয়ই আছে। আমাদের দেবে না আর কি।

স্ত্রী কিন্তু কোনো কিছু বলে না। মারাত্মক উদ্বেগের শীকার হয়ে দিন কাটাচ্ছে। বা ফি ব্যঙ্গ করে বলে

- জানো, আজ কদিন ধরে এরা চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। এইবার ওরা খতম হবে, আর দেরী নেই। দুদিন কি চারদিন। আমাদের মুরুব্বিরা এসে পড়বেন।

এর পর বা-ফি তার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয়—কেঁদো না চুপ কর।

আমি বলছি কান্নার কিছু নেই। এ যাত্রায় আমাদের মৃত্যু নেই। ওরা এসে পড়বেন, আমরাও মুক্তি পাব।

এর পর বা-ফির কণ্ঠস্বর বিদ্বেষে ফেটে পড়ে হারামজাদা বেটারা এইবার টের পাবে। আমি যে কি চিজ তা বুঝবে—সব ব্যাটাকে কাটা হবে। আমি ওদের দলের মোড়ল —হাই-থেপ বেটার মুণ্ডু কাটব, তারপর যারা আমাকে গ্রেপ্তার করেছে তাদের কাটব, তারপর বা-রেন সব শালাকে কেটে কুচিকুচি করব—

বা ফির বউ চেঁচিয়ে ওটে—থামো! থামো! আমি এদিকে ভয়ে মরছি, আমাদের হুজুররা আসবার আগেই ওরা আমাদের গলাটা কেটে উড়িয়ে দেবে।

এই একটি কথায় স্বামী বা-ফির কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হল। এই আত্ত কটাই ওর মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারছে দিনরাত। হুজুররা এসে পড়ার আগেই যে ওরা কেটে ফেলতে পারে এই চিন্তা তারও মনে হয়েছে। তথাপি সামান্য আশার আলোক মনের কোণে জেগে আছে।

দিনরাত জ্বালায় জ্বলে মরে বা-ফি। ওদের স্বামী-স্ত্রীর কি যে অবস্থা হবে তা ভেবে ভেবে আকুল হয়।

বা-ফির স্ত্রীর সুদীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। একটা আলো দেখা যায়। বা-ফি একটু পুলকিত হয়। একটা বাতি ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

অন্ধকারে চোখ এমন জড়িয়ে আছে যে কারা এল তা ঠিক বুঝতে পারে না বা ফি এমন সময় শুনতে পায়—উঠে দাঁড়াও।

লোকটা হাই থেপ বা ফি অতিক্রুত উঠে দাঁড়ায়। ওর স্ত্রীও নিতান্ত বাধ্য রমণীর মত উঠে দাঁড়ায়। হাই থেপ স্ত্রীলোকটিকে নড়াচড়া না করতে ইঙ্গিত করে। তারপর শত্রুর চরটাকে আপাদ-মস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে বলে, কি তোমাদের অপরাধের গুরুত্বটুকু কি বুঝতে পেরেছ? তোমাদের কি মরা উচিত?

বা ফি জবাব না দিয়ে মাথাটা নিচু করে। গলার স্বরটা চড়িয়ে হাই থেপ বলে ওঠে—জবাব দাও। চরটা মৃদু গলায় বলে—হাঁ।

—বেশ!

তারপর একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে হুকুম দেয়, অল্‌রাইট, চলো যাওয়া যাক।

বা ফির পা দুটো ধরে গেছে। বা রেন তাড়াতাড়ি ওর কাঁধটা ধরে নেয়। মনে হচ্ছে যেন ওদের পা দুটি কাটা গেছে। যেন ওদের কোনো জীবন নেই। বা বেন ওকে টেনে বাতির আলোর কাছে নিয়ে যায়।

ওর স্ত্রী পিছে পিছে চলেছে। সে কাঁপছে। এমন সময় বা ফি অচেতন হয়ে পড়ল।

বা রেন বলল—ভালো বিপদ, বেটা আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ল, ললিত লবঙ্গলতা

ওরা বা ফিকে কাঁধে করে গুহার শেষ প্রান্তে নিয়ে গেল। এইখানেই সু আর কোয়েন দুজনে মিলে শহীদদের হাড় সংগ্রহ করে মাটির জালায় ভরে রেখেছে। এক বছর আগে এই হাড় ওরা সংগ্রহ করেছিল।

এই মৃত শহীদদের মাথায় নৌকোর দাঁড় দিয়ে আঘাত করে শত্রু সৈন্যরা গুঁড়ো করে দেয়, তারপর ওদের দেহ ডোবায় ফেলে দেয়।

তিনদিন ধরে সু আর কোয়েন ওদের সন্ধান করেছে। চতুর্থ দিনে ওরা যখন জঙ্গলের ভিতর ঢুকেছে তখন দেখলো বনের কুকুর হাড় মুখে করে পালাচ্ছে, তার গায়ে কিছু গলিত মাংস ঝুলছে। লাঠি উঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিয়ে হাড় সংগ্রহ করেছিল সু, আর কোয়েন ডোবার মধ্যে ডুব দিয়ে বাকী হাড় সংগ্রহ করেছিল।

প্রথমটায় গ্রামের ভিতরই এক জায়গায় হাড়গুলি লুকিয়ে রেখেছিল। হাড়গুলি অবশ্য সনা করা যায়নি। এই অঞ্চলটি শত্রুদের কবল থেকে মুক্ত করার পর মাটির জালায় ভরে গুহার ভিতর এনে রাখা হয়েছে।

বা রেন চরটিকে টেনে নিয়ে একটা পাথরের গায়ে ঠেলে দেয়। ওরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইল। লোকটার কখন জ্ঞান ফিরে আসে দেখার জন্য। বা রেন ওদের দুজনকে বেঁধে রাখল।

বাইরে বেরিয়ে আসার সময় হাই থেপ মন্তব্য করে—ওরা সবাই সমান। ওদের খুন করার সাহস আছে কিন্তু নিজেদের মৃত্যুটা সাহস করে সহ্য করতে পারে না, তাই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। এরা ভীষণ ভীরু। শত্রুদের খবরটুকু মাত্র দিতে পারে তার বেশী আর কিছু নয়।

এই সব কথাবার্তা বলছে এমন সময় নাগান ফিরে এল। মাটিতে নারকেলগুলি রেখে হাঁফায়। টয় ও ট্রং-এর ঐ একই অবস্থা।

কোয়েন তার প্রিয়তমের দিকে এগিয়ে আসে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে ওঠে সু আর নেই।

সবাই চুপ করে থাকে। পাথর হয়ে গেছে সব। যে সব হাত নাগানদের দেখে হাততালি দেওয়ার জন্য উঠেছিল তা স্তব্ধ হয়ে যায়। এমনই স্তব্ধতা যে একটা মাছি উড়ে গেলে তার আওয়াজ পাওয়া যায়।

হাই থেপ নাগানের কাছ ঘেঁষে এসে শোকাতুর কণ্ঠে প্রশ্ন করে—তুমি কি ঐ পর্যন্ত…মানে ওর কাছাকাছি গিয়েছিলে?

না, ও আর সেখানে নেই। গ্রামের লোক নিয়ে চলে গেছে। কয়েকজন সৈনিক বলাবলি করছিল শুনতে পেলাম।

নাগান প্রবেশ পথের মুখে বসে পড়ে সৈনিকদের মুখে যা শুনেছে তা বলে যায়। সু-র শেষ আবেদন এবং হো খুড়োর নাম উচ্চারণের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে নাগানের কণ্ঠস্বর ভেঙে যায়।

কোয়েন নাগানের কাঁধে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। নাগানের গায়ে ঘাম ঝরছে, সেই গায়ে কোয়েন মাথা ঘষছে, সবাই চেষ্টা করছে কান্না চাপবার তবু সবাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

সু যে চরম শাস্তি পেয়েছে তা ওরা বুঝেছিল। তবে ঠিক কি ধরণের

শান্তি সে পেয়েছে তা অনুমান করা যায়নি। তা ছাড়া শেষ মুহূর্তে কি যে তার অবস্থা হয়েছিল তাও বুঝতে পারেনি।

এখন সকলের মনে হয় সু-র প্রকৃত মুল্য ওরা কেউ জানতো না—কি মেয়ে তা বোঝেনি কেউ—ওর এই দৃষ্টান্ত সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে।

সুর ভদ্রতা, নম্রতা, ভব্যতা, দৃঢ়তা, বিশ্বস্ততা, সৌন্দর্য আর শালীনতার কথা সকলের মনে পড়ে। এই মুহূর্তে মেয়েটির সকল গুণ যেন স্পষ্টতর হয়ে উঠল। কি শান্ত হাসিই না হাসত মেয়েটা

মেয়েটির স্মৃতি কোনদিন মন থেকে মুছে ফেলা যাবে না। ওর শেষ কথা সকলের অন্তরে গাঁথা থাকবে।

আর একবার হাই থেপের মনে হল যে অদৃশ্য এক জন্তুর তীক্ষ্ণ দাঁত আর নখ তার বুকটা বিদীর্ণ করে দিয়েছে। ধীর ভঙ্গীতে উঠে পড়ে হাই থেপ বলে —আমাদের জন্য কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই না রেখে গেল মেয়েটা। আমাদের কি যত্নই করত, প্রতিটি ভাতের দানা, প্রতিটি জলবিন্দু সে সতর্ক দৃষ্টিতে পাহারা দিত। মেয়েটার মধ্যে এতটুকু স্বার্থপরতা ছিল না। দেখো শত্রুর কাছে কিভাবে মাথা উঁচু করে রেখেছিল মেয়েটা! কই এতটুকু মাথা নোয়ায়নি তো। আমাদের হুকুম করেছে অস্ত্র ছেড়োনা। সে বলেছে প্রতিশোধ নিও তোমরা, কমরেডবৃন্দ আমরাও শপথ নিলাম তার আদেশ আমরা মাথা পেতে নেব। তার আদেশ আমরা মানব।

বিনা বাক্যব্যয়ে সবাই উঠে এক মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই মধুর স্বভাবের মেয়েটার কথা সবাই ভাবে। প্রতিটি রাইফেলের ঘোড়ার কাছে আঙুল চলে যায় সকলের। সবাই শপথ নেয় শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও লড়াই করবে।

আর কেউ কাঁদে না। চোখ থেকে জল মুছে নেয়। আজ রাতটা কাটুক। প্রভাতে শত্রুর পরবর্তী আঘাত প্রতিহত করতে হবে।

বা রেন বলে—খাঁটি সোনার আগুনে ভয় নেই, সু ছিল খাঁটি সোনা। সে তো আর ওই বা-ক্ষির মত নয় যে অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়বে।

নাগান প্রশ্ন করে—অজ্ঞান হয়ে পড়ল কেন ?

—ভেবেছিল আমরা বুঝি ওকে খতম করব।

হাই থেপ নাগানের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কতগুলি নারকেল পেলে ?

—তিন কাঁদি।

—খুব ভারী ছিল নাকি ?

—না। তেমন ভারী নয়, তবে ওরা আমাদেব খুব কাছাকাছি ছিল কিনা, আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে, ওরা যখনই গুলি ছুঁড়েছে আমবা তখনই নারকেল পেড়েছি, আওয়াজটা চাপা পড়েছে। আমরা দুজন সৈনিকের সমস্ত কথাবার্তা শুনেছি—ওরা এত কাছে ছিল যে, সিগারেটের আলোয় মুখও দেখতে পেয়েছি। ওরা এখানে আসতে হয়েছে বলে বড় ভয়ে ভয়ে আছে। আমাদের গুহার নামকরণ করা হয়েছে "মৃত্যুগুহা"।

হাই থেপ বলে—নামটা তো মন্দ নয়। মৃত্যু গুহা বৈকি, তবে ওদের পক্ষে প্রযোজ্য. এ দেশ আমাদেব কাছে হোন দাৎ।

নাঘিয়েপ বলে ওঠে—হাঁ, হোন দাৎ (এই কথাটির অর্থ শীতল মৃত্তিকা আর সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ) কথাটির মধ্যে একটা মধুবতা আছে—তবে ওরা একটু স্পর্শ করে দেখুক না, কাঠ খেলে অঙ্গার উগরোতে হবে।

নাগান বলে—ওদের দলে ইয়াঙ্কিরাও আছে। আমরা একটাকে সাবড়েছি।

—হাঁ।

—হাঁ, শুনলাম বটে কাল একটা হেলিকপটার এসেছিল লাসটাকে নেওয়ার জন্য।

সবাই একেবারে ক্ষেপে উঠেছে, ইয়াঙ্কি পাইলট সাধারণ সৈনিকদেব নিয়ে যেতে রাজী হয়নি কিছুতেই। এমন কি যাদের আঘাত গুরুতর তাদেরও নয়।

—হারামজাদা বেজন্মার দল।

—হাঁ। তবে কি জানো, এতে অনেকের চোখ খুলে যাবে। যারা মনে করেছিল ইয়াঙ্কিরা ওদের সঙ্গে আছে তারা বুঝবে। ইয়াঙ্কিরা কুকুর ভালোবা'সে বটে, তবে পেশাদার সেনাদের নয়। ওরা মরুক--ওরা যদি খঞ্জ হয়ে ঘুরে বেড়ায় কার কি--প্রভুদের কাজে ওরা লাগবেনা সুতরাং ওদের আর দেখা শোনার প্রয়োজন কি!

--আমার মনে হয় সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়েছে। আমরা যদি ওদের কাছে আবেদন জানাতে পারতাম তাহলে খুব তাড়াতাড়ি সব ভেঙে পড়ত।

বা রেন বলে—শুধু তাম চেন বা ওর মত আরও যারা আছে তারাই পারবে এ কাজ, কারণ ওরা গ্রামে আছে। এখানে যতবার ওরা আমাদের সামনে আসছে আমরা ওদের নাক ভেঙে দিচ্ছি। এখানে আব আবেদন জানানোর অবকাশ কই!

তু নাঘিয়েপ বাধা দিয়ে বলে--কেন নয় শুনি? আমরাও পারি, শুধু একটা মেগাফোন দরকার। এক হাতে লড়াই করবো আর হাতে ওদের বোঝাবো, কেমন? এই ভাবে আমরা তাড়াতাড়ি ওদের মনোবল ভেঙে দিতে পারব।

নাগান বলল--যুক্তিটা ত উত্তম, তা দাদাভাই মেগাফোনটা পাওয়া যাবে কোথায়?

একটু ভেবে নিয়ে নাঘিয়েপ প্রস্তাব করে। দেখো ঐ যে হাড় ভর্তি জালা গুলো আছে ঐ দিয়ে আর টিন জড়িয়ে আমরা মেগাফোন বানিয়ে নেব। হাড়গুলি উপস্থিত তালপাতায় মোড়া থাকুক, আমাদের শহীদদের আত্মা তাতে অসন্তুষ্ট হবে না।

বা রেণ বলে ওঠে—নিশ্চয়ই। আমরা যদি অস্ত্র সমর্পণ করে পরাজয় মানি তাহলে ওরা অসন্তুষ্ট হবে। তা ছাড়া মরা গরু কি ঘাস খায়?

—ছি বা রেন ওভাবে কথা বলতে নেই। মৃতের প্রতি সম্মান

রাখা কর্তব্য। আমার মনে হয় ওদের স্পর্শ করলেও ওদের শান্তি বিঘ্নিত হবে।

বা রেন চুপ করল কিন্তু ঝুঁকে পড়ে জড়ানো গলায় বলে—বেশ, তোমরা যা ভালো বোঝ তাই হোক, তবে আমি লক্ষ্য করছি যে কিছুদিন ধরে তোমরা একটু বেশী কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছ।

তু নাঘিয়েপ প্রতিবাদ জানিয়ে আমতা আমতা করে বলে—না, ঠিক তা নয়।

হাই থেপ ইঙ্গিতে সব বিতর্কের অবসান করে দেয় তারপর বলে—শোনো শোনো, তু নাঘিয়েপের কুসংস্কারের এটা একটা দৃষ্টান্ত নয়। যদি ঐ জালায় কাজ হয় তাহলে তা করতে পারো, এতটুকু ইতস্ততঃ করার প্রয়োজন নেই। আমাদের মৃত শহীদরা প্রীত হবেন। তাড়াতাড়ি করো—

তু নাঘিয়েপ সোৎসাহে বলে ওঠে চমৎকার।

আমি ভার নিচ্ছি। অর্থাৎ…

তু নাঘিয়েপ এই বলে মেগাফোন বানানোর কাজের ভার নিজের হাতে নিয়ে নেয়, কিন্তু তবু বা রেনের মন্তব্যে সে অসুখী হয়ে রইল। স্বর্গ এবং বুদ্ধদেবে বিশ্বাসী হলেও সে যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন একথা মানতে রাজী নয় কিছুতেই।

পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার সময় সে পাঁজর চুলকাত আর বলত এই গ্রহের তিন বিলিয়ন মানুষ স্বর্গ ও বুদ্ধে বিশ্বাসী না হলেও একজন থাকবে যার বিশ্বাস অটুট থাকবে।

তারপর নিজের বুকে চাপড় মেরে বলত—সেই মিঞার নাম তু নাঘিয়েপ।

সে নিরামিষ ভোজন ত্যাগ করেছে তার কারণ হিসাবে বলে এটা হার্টের ব্যাপার, স্টম্যাকের (পাকস্থলীর) ব্যাপার নয়। নিরামিষ খেয়ে বেশী কাজের উৎসাহ পাওয়া যায় না। তাছাড়া ক্রমশ ফ্যাকাশে চেহারা হয়, সে অতি বিশ্রী।

সব মনপ্রাণ দিয়ে সে পার্টির সদস্য হতে চেয়েছিল। একবার সে হাই থেপকে প্রশ্ন করে আমাকে নেবে ?

হাই থেপ বলেছিল—তুমি সত্যের দিকে তাকাবে। পার্টি সদস্যরা সকল ধর্মের বিশ্বাস এবং বিশ্বাসীদের শ্রদ্ধা করে, তবে সে নিজে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। বুদ্ধ বা স্বর্গ কিছুই সে বিশ্বাস করে না। আমি ঢাক ঢাক গুড় গুড় না করে বলছি, ভাই আমরা শোষক আর শোষিতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আমি বিশ্বাস করি মার্কিণ ও দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে একত্র লড়াই করে আমরা শান্তি পাব। কিষাণরা জমি পাবে। আর সব ধর্মই সংরক্ষিত হবে।

তু নাঘিয়েপ মার্কিন এবং নগো দিন দিয়েমের সঙ্গে লড়াই করতে রাজী, তবে হাই থেপ পার্টিসদস্যদের কি রকম হওয়া উচিত তা বলার পর সদস্য হয়ে পড়া একটু কঠিন মনে করেছে। ওর বেদনার পিছনে আছে এই বৈপরীত্য।

বা রেনের রসিকতা তার গোপন বেদনার দ্বারে আঘাত করেছে। তু নাঘিয়েপ দোষ ধরছে না। তা ছাড়া কারো ওপর রাগ করার মতো স্বভাব তার নয়।

কয়েক মিনিট পরে সবাই দেখল ও একটা বাতি জ্বালিয়ে গুহার পিছনে গেল তারপর মেগাফোন বানানোর কাজ সুরু করে দেয়।

এই পাথরটার ঠিক উপরেই কোয়েন সবে লম্বা হয়ে শুয়েছে থুয়াকে নিয়ে। থুয়া কিছুই জানে না, নীরবে ঘুমোচ্ছে।

কোয়েন চারদিকে লক্ষ্য রেখেছে, ছায়া দেখছে। তার চোখ শুখনো কিন্তু জ্বলছে।

তারপর থুয়ার দিকে পাশ ফিরে তাকে জড়িয়ে ধরে।

তৃতীয় খণ্ড

এক

হাই থেপের বাড়িতে মাটির তলায় একটি গুপ্ত কক্ষ ছিল। এই গুপ্ত কক্ষটি অন্ধকার দিনে তৈরি করা হয়। আজ দেশের ভারী দুঃসময়। মুক্তিলাভের পর সেক্রেটারি এই গুপ্ত কক্ষটি নষ্ট না করে বরং এটিকে আরো দৃঢ়তর করেছেন।

বাড়ির ঠিক মাঝখানে এই পাতাল কক্ষ, এর চারদিক থেকে সুড়ঙ্গ রচনা করে বেরোবার পথ করা হয়েছে। সুড়ঙ্গগুলি একেবারে সোজা ধানক্ষেতে চলে গিয়েছে।

শত্রু যদিও কোনোদিন এই গুপ্ত কক্ষের সন্ধান পায় তবু কিছুতেই এই কক্ষের বাসিন্দাদের খুঁজে পাবে না।

সংঘর্ষের সূত্রপাত থেকেই তাম চেন এইখানে থাকত। প্রতিদিন কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে এসে মুক্ত বায়ু সেবন করত তারপর আবার বাতির আলোয় কাজ করার জন্য নেমে যেত।

আজ সূর্যের শেষ কিরণচ্ছটা যখন মিলিয়ে আসছে মিসেস হাই থেপ কোথা থেকে কিছু খবর নিয়ে ফিরে এল। সে পা দিয়ে এই গুপ্ত কক্ষের ওপর তিনবার সংকেত করল। তারপর মুখটা খুলল। তাম চেন বেরিয়ে আসতেই ম্লান গলায় বলল—সু আর নেই, শেষ পর্যন্ত মারাই গেল।

তাম চেনের মুখে সুগভীর বেদনার ছাপ অনেকক্ষণ জেগে রইল। তারপর সে মৃদু স্বরে বলে -কখন?

--এই এখনই। এখনও এক ঘণ্টা হয়নি। স্যাম তলোয়ার দিয়ে আঘাত করা সত্ত্বেও প্রায় সমস্ত দিন প্রাণটুকু ছিল। আমরা কোনোরকমে দেহটুকু উদ্ধার করতে পেরেছি। সবাই একেবারে ভেঙে পড়েছে। সৈন্যরা তো কিছুতেই ছাড়বে না, ভীষণ ভীড়

হয়েছিল, আমরা ওদের সঙ্গে হাতাহাতি করে দেহটা ছিনিয়ে এনেছি।

- এখন দেহটা কোথায় ?

জননী সাউ-এর কাছে। ওঁর বাড়িতে ভীষণ ভীড় হয়েছে।

তাম চেন সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তারপর গুপ্ত কক্ষের মুখে হেলান দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অবশেষে সে বলে ওঠে, এখন ওখানেই যাও। একটা শোকযাত্রার আয়োজন করো। এই শোকযাত্রাটাই আমাদের প্রতিবাদ। গ্রামের সমস্ত লোকজনের মনে শত্রু সেনাদের ওপর প্রচণ্ড ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে হবে।

এই গুপ্ত কলের দরজাটা বন্ধ করতে করতে মিসেস হাই থেপ বলে—আমরাও তাই ভেবেছিলাম এখন যাই, সব ঠিক করে ফেলি।

তাম চেন হঠাৎ বলে ওঠে—দাঁড়াও ! আচ্ছা শোভাযাত্রাটা গুহার ধার দিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে কি ?

চোখ দুটো বড় বড় করে হাই থেপের স্ত্রী বলে- কেন বলো তো ?

তাম চেন তাকে বসতে ইঙ্গিত করে। তারপর ফিসফিস করে ওর মতলবটা প্রকাশ করে। শেষ করে বলে ওঠে—কেমন ? পারবে তো ? এটা বেশ গুরুতর ব্যাপার।

—আমি চেষ্টা করব। আর সবায়ের সঙ্গে পরামর্শ করি। যদি এতটুকু সুবিধা থাকে তাহলে আমরা করবই।

— শোন বোন, খুব সাবধান কিন্তু। এতটুকু ঢিলেমি চলবে না। দড়ি খুব জোরেও টেনোনা। সেনাদের সঙ্গে নতুন কোনো সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। ভালো কথা, তোমার বাচ্চারা সব কোথায় ?

—একজন প্রতিবেশীর হাতে তুলে দিয়েছি, সেই দেখাশোনার ভার নিয়েছে।

হাই থেপের স্ত্রী অতি দ্রুত সেই গোপন কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেয়, তারপর চারপাশে কিছুক্ষণ ঘোরা-ফেরা করে চলে গেল।

আধো আলো আঁধো অন্ধকারে জননী সাউ-এর বাড়ির উঠোনে হাজার হাজার গ্রামের লোক এসে জড়ো হল। মিসেস হাই থেপ যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সবাই মিলে মৃতকে কফিনে শোয়ানোর ব্যবস্থা করছিল। জননী সাউ অতি সন্তর্পণে মৃত মাথাটি নিজের কোলে তুলে ধীরে ধীরে তার মাথাটি আঁচড়াতে লাগলেন। মোষের শিং-এর বাঁকা চিরুনী দিয়ে দীর্ঘদিনের অভ্যাস মত অতি সন্তর্পণে মেয়ের মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছেন।

আজকের চুল বাঁধার পদ্ধতি ভিন্ন। অনেক সময় লাগছে। সামান্যতম স্খলন টুকু তিনি পরিহার করলেন সযত্নে।

তারপর হাই থেপের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সংযত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন--একবার ঐ দিককার চাতালটায় দেখো না পাশে, সব বাক্সটার ভেতর গন্ধতেল, তেল আছে কিনা। আহা, বেচারী এই তেলটা বড্ড ভালোবাসতো। মাত্র কয়েকদিন আগে একটা নতুন শিশি কিনে এনেছিল, বেশী দিন লাগাতে পারেনি।

হাই থেপের স্ত্রী শিশিটা এনে জননী সাউ-এর হাতে দিতেই তিনি খানিকটা তেল নিজের হাতে ঢেলে নিয়ে মৃতের মাথায় মাখিয়ে দিলেন। মৃতের চুল আঁচড়ানোর সময় একটা মধুর সুরভিতে ঘরটি ভরে গেল। জননী সাউ একটি খোঁপা বাঁধতে লাগলেন। কতবার মেয়ের চুল তিনি নিজের হাতে বেঁধে দিয়েছেন। এই চুল তাঁর কত পরিচিত।

আজ তিনি খুব মন দিয়ে খোঁপা বাঁধছেন। এ এক বিরাট খোঁপা। সে জীবিত অবস্থায় এমন খোঁপা কখনও বাঁধেনি। আজকের খোঁপাটি তুলনাহীন। এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। জননীর

হাতে কন্যার এই সর্বশেষ কবরী বন্ধন। তাই আজ মা সব স্নেহ উজাড় করে খোঁপা বাঁধছেন।

খোঁপা বাঁধা শেষ হলে মেয়েকে তার ছাড়তে ইচ্ছে হয় না। নিজের মাথা থেকে একটা প্রকাণ্ড পিতলের কাঁটা টেনে নিয়ে জননী সাউ মেয়ের খোঁপায় গোঁথে দিলেন। স্যামের তরবারি দিয়ে যে চুলগুলি কাটা পড়েছিল সেই সব চুল বেদীর ওপর রাখা হল।

তারপর জননী সাউ নীরবে কাঁদতে থাকেন। সবাই মিলে জননীকে তুলে নিয়ে খাটের ওপর শুইয়ে দিল, আর হাই থেপের স্ত্রী এবং বারেনের স্ত্রী দুজনে মিলে ধরাধরি করে সু-কে কফিনে শুইয়ে দিলেন। ওঁরা যখন কফিনের ঢাকনাটি চাপা দেওয়ার উপক্রম করছেন তখন জননী সাউ ছুটে সবাইকে টেনে তুলে সেখানে গিয়ে পড়লেন। কিন্তু কি আর দেখবেন, ওরা কফিনের ঢাকাটা চাপা দিয়ে দিল। জননী সাউ কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

কফিনটা লালরঙের, ঘন লাল রঙ। সু যেখানটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ঠিক সেইখানেই তার কফিনটা রেখে দেওয়া হল। এখানেই সে ছোটবেলায় খেলাধুলা করেছে, এখানেই বড়ো হয়ে উঠেছে। হাসি, কান্না, তার বাল্যজীবনের খেলাধূলায় এই প্রাঙ্গন ও ঘর মুখরিত হয়ে উঠেছে। এখন সেইখানেই শুয়ে আছে। এই ওর শেষ ঘুম। এর পিছনে তার জীবনের সাতাশটি বছর পড়ে রইল, যে বছরগুলি কোনো দিন মুছে যাবে না। এই কালটি এক মহিয়সী বীরাঙ্গনার জীবনের অংশ—আর ভরে রইল সেই তেজস্বিনী রমণীর জীবনের শেষ কটি মুহূর্তের আলোয়।

নারকেল পাতার মশাল এবং দ্রুত-নির্মিত খড়ের মশাল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই প্রাঙ্গনটি আলোয় ভরে উঠল।

জননী সাউ-এর বাসনা সুকে তার পরলোকগত পিতার পাশেই কবরস্থ করা হোক। পাহাড়ের গায়ে সেই কবর। সোজাসুজি সেই জায়গায় না গিয়ে ওরা বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে ফিরে মিছিল নিয়ে চলল।

গ্রামের ধানক্ষেত বাড়িঘর ইত্যাদির ধার দিয়ে মিছিল এগিয়ে চলল। এই মিছিল যেন "লং-মার্চ"। একটা বাগিচার মাঝামাঝি পেশাদার সৈন্যদল রুখে এল—দাঁড়াও! দাঁড়াও! তোমরা কি জানোনা কারফিউ জারি করা হয়েছে? কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

—তোমরা আমাদের মেয়েকে হত্যা করেছ, আমরা ওকে কবর দিতে যাচ্ছি।

সৈন্যদলের প্রধান দুই হাত দিয়ে পথ নির্দেশ করে বললেন: অলরাইট, অলরাইট! এগিয়ে যাও। তোমরা দেখছি শবযাত্রাকেও একটা প্রতিবাদ মিছিলে পরিণত করতে পারো।

অনুচরদের ইঙ্গিত করে কম্যাণ্ডার বললেন—ছেড়ে দাও। মিছিলটা যাক। মিসেস হাই থেপ মিসেস বা উ শোভাযাত্রার পুরোভাগে, ভীড় বাড়ছে। জ্বলন্ত মশালের আগুনে চারদিক উদ্ভাসিত। একটা মশাল পুড়ে শেষ হলে সকলের হাতে আরেকটি করে টর্চ আছে জ্বেলে দেওয়া হবে। চারজন মহিলা কফিনটা বইছেন, সেখানে মশালের আলো ঝক্ ঝক্ করছে, আর সবাই কি যেন বিড় বিড় করে বলছে। মশালের আলোয় কফিনের লাল রঙটা যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মশালের আলো বয়স্কা রমণীদের চুলে পড়ে চিক্ চিক্ করছে আর ফলভরা পেয়াবা গাছের ওপর পড়ে চারদিকে এক অপূর্ব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে।

কফিনের ঠিক পিছনেই রয়েছেন জননী সাউ, তাঁর কাছে কাছে আছে হাই-থেপ আর বা রেনের স্ত্রী, সেই সঙ্গে আরও অনেক আত্মীয় ও বন্ধুজন। দুজন স্ত্রীলোক ওঁকে সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হতে জননী সাউ আপত্তি জানিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে চলতে থাকেন। এখন আর তাঁর চোখে জল নেই। কয়েক মুহূর্ত আগে মেয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন বলে মনে যে ভাব জেগেছিল এখন সহযাত্রীদের সান্নিধ্যে সে ভাব আর নেই। এই হট্টগোলে শরীরের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক শক্তি জেগেছে। সু একাই তো আর প্রাণ দেয়নি। আরও কত

জননীর সন্তান গেছে। আশ পাশের এইসব নরনারীর মধ্যে কতজনের স্বামী-পুত্র বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এইভাবে চলে গেছেন কে বলবে? কতজনে তাঁদের প্রিয়জনকে বর্বরোচিত ভঙ্গীতে নির্যাতিত হতে দেখেছেন। কারো নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করেছে, কারো বা জিভ কেটে দিয়েছে, কারও একটা হাত বা পা কেটে নেওয়া হয়েছে। তাদের জ্বালা কি কিছু কম? এইসব প্রতিবেশীদের মধ্যে কতজনের আত্মীয় স্বজনের কারাদণ্ড নয়তো সুদূর পৌলো কনডোরে নির্বাসন হয়েছে।

সাতটি বছর—

হোন-দাৎ গ্রামের একটিও পরিবার এমন নেই যাঁদের কিছু না কিছু নির্যাতন ভোগ কবতে হয়েছে।

কত রক্তের স্রোত বয়ে গেছে—

কত জননীর চোখের জল -

কে সে সব ভুলবে?

কোনদিন কি কেউ সেই যন্ত্রণা ভুলতে পারবে?

জননী সাউ শুধু একা নন, সবাই তো একই জ্বালায় জ্বলছেন।

একা সু তো লড়াই করেনি। হোন-দাৎ-এর শত শত বাসিন্দা আর দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অজস্র সহযাত্রী!

সমুদ্রে কল্লোল যেন সমস্ত শোকের জ্বালা ভুলে গিয়ে এগিয়ে চলতে উদ্বুদ্ধ করে তুলছে।

ওরা সবাই নদীর প্রান্তে এসে পৌঁছাল, এরই খুব কাছাকাছি সেনাদলের ছাউনি—এই রকম জোনাকি পোকার মত আলোর সমারোহ দেখে সবাই ছাউনি থেকে একে একে বেরিয়ে এল—

কাপ্তেন কাও এই ব্যাটালিয়নের কম্যাণ্ডার—তিনি কফিন দেখেই এক নজরে বুঝে নিয়েছেন ব্যাপারটি। তিনি তাঁর অনুচরদের বললেন

অস্ত্র নিয়ে নদীর ধারে লাইন দিয়ে দাঁড়াও। নিজে দৌড়ে গিয়ে জনতার সামনে দাঁড়ালেন।

—হল্ট্! হল্ট্! থামো—থামো সব –

মিসেস বা উ তাঁর সামনে এগিয়ে গিয়ে যথাসম্ভব কোমল গলায় বলল —ক্যাপ্টেন, সার্ - আপনারা আমাদের একটি মেয়েকে হত্যা করেছেন। এখন আমাদের অন্ততঃ কবর দিতে দিন।

—জানো, কম্যাণ্ডার রাতের বেলায় কোনো রকম চলাচল নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

—হ্যাঁ, তা বটে। তবে মেয়েটিকে এমনই বীভৎসভাবে হত্যা করা হয়েছে যে ওকে এখনই কবর দেওয়া প্রয়োজন।

—ভিয়েৎকংদের এর চেয়ে আর কি হবে? ওর যা হয়েছে তা বরং ওর পক্ষে ভালোই বলা যায়

- ভিয়েৎকং কিনা জানিনা ক্যাপ্টেন, মেয়েটি আমার ভাইঝি। আমরা যদি পাহাড়ের ওপরকার গোরস্থানে ওকে কবর দিই আপনার আপত্তি কিসের? দেখুন সার! কি বীভৎস ভাবে ওকে হত্যা করা হয়েছে একবার ভেবে দেখুন।

—এই মোটা মেয়েমানুষটি ক্রমেই দুর্বিনীত হয়ে উঠছে। চুলোয় যাক। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? কম্যাণ্ডার রাতের বেলায় সবরকম চলাফেরা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

গভীর হতাশার ভঙ্গীতে মাদাম বা উ হাতদুটি নামিয়ে দেয়— আমি জানতাম আপনিই হুকুম দেওয়ার কর্তা –এখন দেখছি সব কম্যাণ্ডারের হাত। বেশ, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন, আমি অনুমতি চেয়ে নেব।

ক্যাপ্টেন কাও ওঁর মাথাটা একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে আন্দোলিত করলেন। বললেন- ও তোমরা কম্যাণ্ডার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাও, তার অর্থ এক হাত লড়তে চাও, কেমন? আমি তোমাকে দেখেই বুঝেছি তুমি একটি পালের গোদা –

একজন সৈনিক বলে ওঠে আমি ওকে বাচ গিয়ায় প্রতিবাদ মিছিলে অনেকবার দেখেছি।

তুমি মূর্খের মত কথা বলোনা। আমি ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে কথা বলছি, উনি এখানে এসেছেন কেন হে?

তারপর সশ্রদ্ধ ভঙ্গীতে ক্যাপ্টেন কার্লের দিকে তাকিয়ে বলেন ক্যাপ্টেন স্মার দয়া করে বলুন। কমান্ডার সাহেব নিশ্চয়ই অনুমতি দেবেন। আপনারা গুণ্ডা ভিতরকার ভিয়েৎকঙদের সঙ্গে লড়ুন, এক আমেরিকান বন্দীকে হত্যা করুন, সে এ পর্যন্ত। আমাদের কবর দেওয়ার কাজে বাধা দেন কেন?

অফিসার উচ্চ গলায় বলে ওঠেন—আমার জবাব 'নো' না, হবে না! অনেক নাকিকান্না কেঁদেছ, এখন যাও।

মিসেস বাউচার আত্মসংবরণ করতে না পেরে বলে ওঠে—তাহলে বিনানুমতিতেই চলো।

অধিনায়ককে চাইতে থাকে অগ্রসরণ করার ইঙ্গিত করল দলের প্রায় সবাইকে।

জনতা সেনাদের নদীর দিকে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে চলে।

ক্যাপ্টেন আবার চীৎকার করে বলে ওঠেন—হল্ট অর আই ফায়ার। দাঁড়াও। নইলে আমি কিন্তু গুলি করব।

কেউ দাঁড়াল না। মশাল উঁচিয়ে চলল ওরা নদীর বুকের দিকে চলল জলে মশালের প্রতিবিম্ব। ক্যাপ্টেন তাঁর দলবলের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে পরামর্শ করলেন, বললেন ফাঁকা আওয়াজ কর।

রাইফেল উঁচিয়ে তুলল সবাই। সেনারা কয়েকবার গুলি ছুঁড়ল। মানবিক প্লাবন অব্যাহত।

কফিনটা নদীর তীরে পৌঁছে গেছে। মিসেস তাই থেপ জনগণকে আশ্বস্ত করে বললেন- এ হল হুঁসিয়ারি আওয়াজ। ভয় নেই। এগিয়ে চল।

অভিজ্ঞতা থেকে ওঁরা জানেন যে এই রকম অবস্থায় এগিয়ে

যাওয়াই ভাল। সবাই শান্ত, এমন ফাঁকা আওয়াজে ওরা অভ্যস্ত। এ ছাড়া ওরা সবাই জানত যে সুকে কবরস্থ করা ছাড়াও আর ও একটি বড় কাজ আছে, হোন দাৎ গ্রামটিকে ত্রাণ করার উদ্দেশ্যে যাঁরা প্রাণপণ করে লড়ছেন, গুহাবাসী সেই বীরগণের জন্য খাবার ও অন্য সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার কাপড়ের তলায় লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কাপ্তেন কাও অভিজ্ঞ ব্যক্তি, এই জাতীয় জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। তাই তিনি জনতাকে গুলি করতে চাননি।

দু তিনবার কিছু সংখ্যক মিছিলকারীদের গুলিচালনার ফলে, কিল, চড় ঘুষি, আর নুড়ির আঘাতে ওরা অনেককে ঘায়েল করবে। আগে উনি মনে করতেন—প্রথম মৃত্যুতেই সবাই পালাবে বুঝি। এই সব অভিজ্ঞতার ফলে তিনি এইবার বাড়াবাড়ি করতে সাহস পেলেন না।

হোন দাৎ-এ আসার পর থেকেই ওদের কম্যাণ্ডার বলে আসছেন যে—গুহাবাসী ভিয়েৎকঙদের মারতে হলে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন এই অঞ্চল থেকে যেন কোন রকম আন্দোলন মাথাচাড়া না দিয়ে ওঠে। এই সব স্ত্রীলোক যদি খেপে তবে আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। সব সময় আমার কাছ থেকে হুকুম নিয়ে তবে কাজ করবে।

কম্যাণ্ডার সাহেবের এই সুবুদ্ধিতে কাও মনে মনে খুসী।

এখন এই স্ত্রীলোকরা অবাধ্যতা করে এগিয়ে চলেছে। সব চেয়ে ভালো হবে ওপরওলাদের কাছে খবর পাঠানো।

তাড়াতাড়ি কম্যুনিকেশ্যন টেন্ট-এ দৌড়ে গিয়ে রণক্ষেত্রের টেলিফোনটির হাতল ঘোরালো কাও, অনেক পরে নিদ্রাবিজড়িত কণ্ঠে অপারেটর প্রশ্ন করে—কে ডাকে?

—আমি তৃতীয় ব্যাটালিয়নের কাপ্তেন কাও, তাড়াতাড়ি কম্যাণ্ডারকে দাও।

—কাপ্তেন সাহেব তিনি তো ঘুমিয়ে আছেন।

—আরে বাপু, ডেকে দাও না। জরুরী ব্যাপার। এ গ্রামের অধিবাসীরা সবাই প্রতিবাদ মিছিলে বেরিয়েছে—এতক্ষণে নদী পার হয়ে গেল। জলদি খবর দাও।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর কাও অপর প্রান্তে কম্যাণ্ডার সাহেবের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। কাওকে রুক্ষ গলায় কম্যাণ্ডার প্রশ্ন করেন—কিসের আবার প্রতিবাদ মিছিল! এসব কি বলছ?

—হাঁ, কমাণ্ডার সাহেব এতক্ষণে ওবা নদী পার হয়ে গেল।

—ভালো জ্বালা। গোটা কয়েক ফাঁকা আওয়াজ করো।

—তা করেছি, কম্যাণ্ডার সাহেব তাতে কাজ হয় নি। ওরা সেই ভিয়েৎকঙ স্ত্রীলোকটিকে পাহাড়ের নীচে কবর দিতে নিয়ে যাচ্ছে। আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও নদী পার হয়েছে। আমি কি গুলি করব?

—না, না, তাতে আমাদের আরো জ্বালা বাড়বে। যদি নদী পার হয়েই থাকে ওদের পিছে পিছে ধাওয়া করে থামানোর চেষ্টা কর।

—হাঁ, কমাণ্ডার সাহেব তাই করছি।

কাও আবার ছুটল টেলিফোন নামিয়ে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে।

নদীর কাছাকাছি কেউ নেই।

শেষ মশালটিও নারকেল কুঞ্জের ভিতর মিলিয়ে গেছে। এখন মাঝে মাঝে গাছের পাতায় আলোর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

কাপ্তেন একটি প্লেটুনের পুরোভাগে নদী অতিক্রম করে ওদের পিছু নিলেন।

এই সেনাদল শোভাযাত্রীদের পিছনের অংশের কাছাকাছি

পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই সামনের দিকের কিছু ছায়ামূর্তি মিছিলের লাইন ছেড়ে অন্ধকারে দৌড়াল। ওরা গুহার দিকে ছুটেছে।

প্রথম গেল কা মাই। তার হাতে খড় জড়ানো একপাত্র পানীয় জল, আর এক হাতে খিচুড়ি ভাত। যতটা দ্রুততা পায়ে আনা সম্ভব ততখানি দ্রুততার সঙ্গে সে দৌড়াল।

ওর পিছে পিছে আরো অনেকেই ছুটলো খাবার আর জল নিয়ে।

গুহার সামনে পৌঁছাতে একটি গুলি একেবারে মাথার চুল ছুঁয়ে চলে গেল। ভয় পেয়ে একটু থমকে দাঁড়িয়ে সে চীৎকার করে ওঠে---

- -আমি! ভাইসব আমি কা মাই! আমি খাবার জিনিস নিয়ে এসেছি।

বজ্রাহত বিস্ময়ে শাস্ত্রী বলে ওঠে হা ভগবান! তুমি কা মাই। আমি কি তোমাকে আঘাত করেছি, লেগেছে?

—না, না, কিছু ভেবো না।

কা মাই হাঁফাচ্ছে, তার কণ্ঠস্বরে তোতলা ভাব। সে জলের বোতল এবং খিচুড়ির পোঁটলা ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে, ভাই। তোমরা সবাই ভালো আছ তো!

—হাঁ।

সু আর নেই। আমরা তাকে কবর দিয়ে এসেছি।

এই সামান্য কয়েকটি কথা বলেই সে দৌড়ে আবার শবযাত্রায় যোগ দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন এল। আর একটি জলের বোতল। আর এক পুঁটুলি খিচুড়ি। প্রতিজনে নিজের নাম বলছে আর তাড়াতাড়ি পালাচ্ছে।

প্রতিটি ছায়ামূর্তিকেই মুক্তিযোদ্ধারা বলছেন, কিছু ভেব না, আমরা ভালোই আছি। দুজন আহত। গ্রামের লড়াই জোরদার

করে তোলো। ক্ষতিপূরণ চাও। ভাড়াটে সেনাদের মনোবল ভেঙে দাও। সব করবে, বেশ দৃঢ়ভাবেই করবে। বুঝলে।

--বুঝেছি।

সহসা সেই অন্ধকারের মধ্যে তু নাঘিয়েপের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—হা ভগবান! ও কে? তুমি বউ নাকি?

- হ্যাঁ গো আমি, আমি এসেছি। এখন যাই।

দ্রুত প্রশ্ন। দ্রুত উত্তর। দ্রুত প্রস্থান। তার মধ্যেই জলের বোতল রেখে যাচ্ছে, খিচুড়ি ভাতের পুঁটুলি রেখেই পালাচ্ছে।

এইসব ছায়ামূর্তির আগমন-নির্গমন ম্লান চন্দ্রালোকেই ছায়া শরীরের মত দেখাচ্ছে। ওদের খোঁপা, বিনুনী, সবই দেখা যাচ্ছে। গেরিলারা তাদের স্ত্রী-কন্যা, ভগ্নীদের চিনতে পারে। যারা আসছে তারা শুধু ছায়ামূর্তি দেখছে। সেই গভীর ছায়ার মধ্যে একটি হাত এগিয়ে এসে জিনিসগুলি নিচ্ছে

সকলের অন্তরে এক অভূতপূর্ব উৎসাহের জোয়ার নেমেছে। মুক্তি-যোদ্ধারাও আনন্দ পেয়েছে। তাদের কেউ ভুলে যায় নি। তাদের মনে রেখেছে সবাই। মেয়ের দলও দেখে গেল এই গুহা একটি দুর্গের মত, এর ভিতর প্রবেশ অসাধ্য। দুপক্ষই বোঝে এই অবস্থা বেশী দিন চলবে না।

ওরা সবাই চলে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি ক্ষুদ্র মূর্তি গুহায় এসে ঢুকল, তার সঙ্গে একটা বাচ্চা কুকুর।

এই ছায়ামূর্তি ঠোকর খেল বা রেনের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে বা রেন তাকে পাকড়ে ধরে প্রশ্ন করে—কে তুমি? কি করছ?

—আমি আমি···আমি কিছু করি নি···আমি একটা গ্রেনেড পেয়েছি—

—হা ভগবান! তুই উট! পোড়াকপাল বাচ্চা উট এসেছে।

—আমি এখানেই থাকছি, আমি কিন্তু আর যাচ্ছি না।

উট বা রেনের হাত ছাড়িয়ে পলকের মধ্যে ভিতরে চলে গেল। সকলের সঙ্গে ধাক্কা খায়। কারো পেটে মাথা ঠোকে, কাউকে চুমা খায়।

আর বলে—আমাকে দেখতে না পেলে ওরা কিন্তু পাগল হয়ে উঠবে।

গুহার ভিতর থেকে কলরব সুরু হয়—কে গো! কার গলা! আমাদের উট না?

ওদের মধ্যে নাম-তেনের কণ্ঠস্বর উট ঠিক চিনতে পাবে। সে বলে---নাম খুড়ো নাকি? জান খুড়ো খুড়ি রোজ বুদ্ধদেবের কাছে ধূপকাটি জ্বালিয়ে প্রার্থনা জানায় তোমার মঙ্গলের জন্য।

—থাম আর রসিকতা করতে হবে না! তোর ভাই আহত হয়েছে. যা ভিতরে গিয়ে দেখে আয়।

ছেলেটি আবেগহীন গলায় বলে আমি তা জানি। তাড়া কিসের? দেখব অখন? আমার বাবাও জানেন। তিনি বললেন যুদ্ধ করতে গেলে অমন একটু-আধটু হয়। ভালো কথা, বলতে ভুলে গেছি, আমার কাছে মা, একটা একেবারে আনকোবা গ্রেনেড আছে, শত্রু সেনাদের কাছ থেকে চুরি করে এনেছি।

কাল যদি ওরা আসে তাহলেই চাবি টিপব আব দুজনেই একেবারে একসঙ্গে অক্কা পাব।

সবাই খিল খিল করে হেসে ওঠে।

—তুই একটা বোকা হাতি। ঐসব কর্ম একেবারে শেষ মুহূর্তে করতে হয়। ওরা যখন অনেকটা তফাতে তখনই গ্রেনেড ছুঁড়তে হয়।

উট হতাশ হওয়ার পাত্র নয়, সে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হলেও বলে ওঠে — আমি অবশ্য কি হিসাবে বলেছি জানো, ওরা যদি একেবারে কাছাকাছি এসে পড়ে তখন মানে একেবারে চরম অবস্থায় আর কি —

—ও তাই ভালো। তবে কি জানিস ভাই গেরিলা, এখানে

এখনও সেই অবস্থা হতে অনেক দেরি। ওদের মাথা দেখলেই গুলি ছুঁড়ছি। খাল করছি। খুব কাছাকাছি এলেই গ্রেনেড ছুঁড়ব।

---সেই ভালো। সবই বেশ চমৎকার হবে। আচ্ছা কোয়েন কোথায়? তাকে দেখছি না যে।

--ভিতরে।

উট তখনই কোয়েনকে দেখার জন্য ভিতরে যাওয়ার উপক্রম করে কিন্তু একটু এগিয়েই আবার থমকে দাঁড়ায়। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে---ওঃ ওঃ—সু-দিদি আর নেই।

গুহার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে অঝোরে কাঁদতে থাকে। সবাই ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে ও হাত ঠেলে দেয়, এমন ভাবে বিড়বিড় করে যেন সকলের ওপরেই ওর রাগ।

তারপর সহসা কান্না থামিয়ে চোখের জল মুছে প্রচণ্ড শব্দে নাক ঝাড়ে।

হাই থেপ তার গলাটি জড়িয়ে ধরে বলে—দেখো উট, তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকো। তবে, ভিতরে গিয়ে থুয়ার সামনে যেন বলোনা যে ওর মা বেঁচে নেই। বুঝলে? ও যদি একবার জানতে পারে তাহলে আর কিছুতেই ওর চোখের জল আমরা থামাতে পারব না। আর তোমার ঐ বিখ্যাত গ্রেনেডটা আমাদের দাও, আমরা তোমারই জন্য যত্ন করে তুলে রাখি।

উট তার ট্রাউজারের ভিতর থেকে এম. কে-৩ বার করে হাই থেপের হাতে দিয়ে বলে—হারাবেন না কিন্তু, তাহলে কিন্তু আপনাকেই দায়ী করব।

—আমি তোমাকে আর একটি দেব। এই জিনিষের যে আমাদের অভাব আছে তা নয়।

সমস্ত খাদ্য দ্রব্যাদি একত্র জড়ো করা হল। হাতের টর্চ লাইট জ্বেলে ওরা গুনল একডজন জলের বোতল, বারো পুঁটলি খিচুড়ি-ভাত

কয়েক প্যাকেট তামাক, এক প্যাকেট রুবিন সিগারেট। এই সব জিনিষগুলির উপর জড়ানো কলাপাতা আজও বেশ টাটকা রয়েছে।

সবাই চেঁচিয়ে ওঠে— এ একেবারে রাজার খোরাক, রাজভোগ।

বা রেন বলে- আজ রাতে আমরা শক্তি সঞ্চয় করব। সবাই বেশ পেট ভরে খাও, পান করো প্রাণভরে। তারপর সবাই একটি করে রুবিন সিগারেট টানা যাবে আর পেশাদারদের বুড়ো আঙুল দেখাব।

হাই থেপ বলে— রুবিন সিগারেট টানলে সবই সম্ভব। তবে জল আর ভাত কিন্তু বুঝে সুজে খেতে হবে, জমিয়ে রাখতে হবে। এই লড়াই এখন বেশ কিছুদিন চলবে। আমার মনে হয় এসব কোয়েনের হাতে তুলে দিই, সেই বুঝে সুজে সব খরচ করবে।

তু নাঘিয়েপ বলে খাদ্য সম্বন্ধে আমি একমত। তবে তামাক আর সিগারেট সম্পর্কে অন্য কথা। ওর রক্ষণভার আমাকে দেওয়া হোক।

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে এই কথায়। এই প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেল। বা রেন শুধু জিভটা কামড়ে কি ভাবে।

তু নাঘিয়েপ তাকে বলে- এই বা-রেন, এখন থেকে সব অমঙ্গল চিন্তা করিস নি। আমাদের সবারের কল্যাণেই আমি তামাকের ভার নিলাম। আমি এমন কিছু 'ইনডিভিজুয়ালিষ্ট' নই। কেমন?

বা রেন আর একবার হাসে। এই কথার কোনো জবাব তার মুখে নেই।

চতুর্থ খণ্ড

এক

মিসেস কা সোই-এর দুঃখের আর অবধি নেই। স্যাম যখন তরোয়াল দিয়ে সু-কে আঘাত করল তখন তার দিকে ছুটে গিয়েছিলেন মিসেস কা সোই। কিন্তু সৈন্যদল ওঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে পা দিয়ে দলেছে। এই অত্যাচারে কা সোই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।

সূর্যাস্তের সময় তাঁর চৈতন্য হয়েছে। কা মাই কাঁদতে কাঁদতে বিছানার পাশে এসে বলল- মা, সু মারা গেছে। তার চুলগুলি আলুথালু, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। এই বলেই সে মাকে একা রেখে চলে গেল।

অনেক চেষ্টার পর মিসেস কা সোই উঠে বসলেন। তাঁর বিহ্বল চোখে কিসের আলো। মাদামের চুলগুলি বাদামি, সেই বাদামি চুলে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে হরিদ্রাভ দেখাচ্ছে। তিনি নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলেন।

ক্রমে রাত হল। মিসেস কা সোই সেই ভাবেই রইলেন। ঘরটি অন্ধকারে ছেয়ে গেল, সেই অন্ধকার তাঁকে গ্রাস করলো। আবার যখন চাঁদ উঠল তখন তাঁর আকৃতি দেখা গেল। তারপর ধীরে ধীরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। যেন এক বিরাট বৃক্ষ পতনোদ্যত।

এই ভাবেই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন মাদাম কা সোই। প্রায় এক ঘণ্টা। তারপর হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চললেন। কয়েকবার পড়ে গেলেন। তবু নীরবে এগিয়ে চলেছেন। সেই অনেকদিন আগে মিসেস বা-উ-র দোকান থেকে যখন মদ কিনে এনেছিলেন তখনও এইভাবে গিয়েছিলেন।

মিসেস কা-সোই-এর দুঃখের অবধি নেই। তাঁর পেটের সন্তান

আজ তুশমন, সেই আজ হোন দাৎ-এ এসে সেই মেয়েটিকে হত্যা করল যাকে যমের এবং ভিয়েৎনামী তুই সমাজের লোকই স্নেহের চোখে দেখে।

এ ছাড়া এই মেয়েটি আর ওর মা যে অনেক সাহায্য করেছেন, অনেক তুঃখের দিনের সহায়। কুড়ি বছর আগে জননী সাউ মাদাম কা সোই-কে নিজের বাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানেই কা-মাই জন্মেছিল, সু-র বয়স তখন মাত্র সাত বছর। মেয়েটি কিন্তু ভারী শান্ত ছিল। আজ মনে পড়ে সেই রাতটায় খুব ঠাণ্ডা ছিল, জননী সাউ আর সু-র মাথায় রুমাল বাঁধা ছিল। ওর মা আর মেয়ে মাদাম কা সোই-কে ধরে ধরে নিয়ে এসেছে, পাছে পড়ে যায় এই ভয়। সব মনে আছে। যখন দোঙ থাচ খা মারা গেল, তখন জননী সাউ আর সু তুজনে মিলে ওর যত্ন করেছে আবার বাচ্চা কা মাইকে দেখাশোনা করেছে।

এই ঋণভার কা সোই কোনোদিন ভুলতে পারবেন না—সারা জীবন ধরে ভেবে আসছেন কি ভাবে এই ঋণশোধ হবে। মাঝে মাঝে অবশ্য জননী সাউকে নানা রকম কাজ করে সাহায্য করেছেনন. যেমন ক্ষেতে নালা কেটে দেওয়া, খামারের কাজ বা ধান ভানা ইত্যাদি। যে পুত্রকে তিনি গর্ভে ধারণ করেছেন তারই হাতে আজ জননী সাউ-এর প্রিয়তমা কন্যার মৃত্যু হল।

স্যাম যেভাবে সু-কে হত্যা করেছে সেই ছবি মাদাম কা সোই-এর মনে জাগছে। তাই তিনি পথ চলতে পারছেন না, পড়ে যাচ্ছেন। স্যাম যে তাঁরই সন্তান। কি পিশাচকেই তিনি গর্ভে ধারণ করেছেন।

জননী সাউ-এর বাড়ি পৌঁছতে যেন অন্তহীন পথ পার হয়ে আসতে হল। কা সোই দেখলেন প্রচুর লোকজন এসেছে। ওরা সবাই মিলে সুকে স্নান করিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু জননী সাউ কর্তৃক মৃতা সুর চুল আঁচড়ে দেওয়ার পর্বটা দেখা গেল না। কারণ প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ানোর সাহস ও শক্তি তাঁর

নেই। পথের ধারে আনারস ঝোপের পাশে কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কা সোই। সেখান থেকেই জননী সাউ-এর কান্না শোনা গেল। কা সোই দু হাতে মুখ ঢাকলেন।

মশালের আলো যখন চোখে এসে লাগল অতিশয় ভীত ভঙ্গীতে মাটিতে বসে পড়লেন কা সোই। আনারস গাছের কাঁটাভরা পাতার ফাঁক থেকে শবযাত্রা নজরে পড়ল। লাল কফিন তাঁর হৃদয় যেন শীতল হয়ে গেল--সজোরে চোখ বন্ধ করে রইলেন কা সোই।

শবযাত্রা পার হয়ে গেল। ওদের মধ্যে কা মাই আছে। ওদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার প্রচণ্ড বাসনা থাকা সত্ত্বেও সাহসে কুলালো না। কা মাই পারে কিন্তু ওঁর সে সাহস নেই। আজ আর তাঁর সহ্য করার ক্ষমতা নেই।

সবাই চলে গেল। মশাল মিলিয়ে গেল। জননী সাউ-এর প্রাঙ্গনে এখন শুধু চাঁদের আলো।

স্যাম তুমি কি পিশাচ। যারা আমার প্রাণ দিয়েছে, বিপদে দেখেছে তুমি তাদের ঘরে শোকের প্লাবন বইয়ে দিলে। ভগবান আ-রাৎ (অর্হৎ) কেন তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন - তিনি যেন তোমাকে ধ্বংস করেন। আমি এই বিরামবিহীন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাই, নিষ্কৃতি চাই।

প্রাণভরে নিজের সন্তানকে অভিশাপ দিতে থাকেন মাদাম কা সোই। তারপর স্খলিতপদে উঠে দাঁড়ান। তাঁর বুকে অসহ্য বেদনা। পথেই পড়ে গেলেন মাদাম কা সোই।

মধ্য রাত্রে জননী সাউ সু-কে কবর দিয়ে ঘরে ফিরলেন। অবচেতন মাদাম কা সোই-এর দেহে পা লেগে হোঁচট খেয়ে ওঁরা তাকে ধরে ওঠালেন। তারপর বাড়ি নিয়ে গিয়ে জামা খুলে মালিশ করা হল, যাতে তাড়াতাড়ি চৈতন্য হয়।

জননী সাউ মাদাম কা সোই-এর বাদামী রঙের চুলের দিকে

তাকিয়ে রইলেন, তারপর অন্যদিকে মুখ ফেবালেন, তাঁব ঠোঁট দুটি দাঁতে চাপলেন। ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে তিনি বান্নাঘব থেকে একটু আদাব কুঁচি নিয়ে এলেন। আদাব কুঁচিটা তাঁব হাত থেকে নিতে গিয়ে মিসেস হাই পেপ দেখলেন জননী সাউ-এব চোখে জল, তিনি তেমনই দাঁত দিযে ঠোঁট কামড়ে আছেন। সেই আদাব অংশ বেশ করে দাঁতে পিষে তাই দিযে কা সোই-এব পিঠে মালিশ চলল। মিসেস বাউ চুল ধবে টানলেন। অনেক পবে মাদাম কা সোই একটু গোঙাতে লাগলেন। এতক্ষণে বোধ হয চৈতন্য ফিবে আসছে।

চেতনা ফিবে আসতেই আবাব সব কথা কা-সোই-এব মনে জাগল। তৎক্ষণাৎ উঠে জননী সাউ-এব পা দুটি তিনি জড়িযে ধবলেন। তাঁব চোখে জলেব প্লাবন, তিনি অনুনয করে বলছেন—জননী সাউ—আমাকে মেরে ফেল। একটা ছুবি নাও—আমাকে মাবো। আমায় মাবো।

জননী সাউ নীবব তারপর তিনিও কান্নায ভেঙে পড়লেন।

মিসেস হাই পেপ মাদাম কা সোইকে তুলে দিযে বললেন—মাদাম সাউ ওকে [illegible] করতে পারবেন না। আপনি ওভাবে কাঁদবেন না, চুপ করুন। মাদাম সাউ, আমরা সবাই স্যামকে ঘৃণা করি, মার্কিনদের ঘৃণা করি আর দাই-মিষ্টদেরও ঘৃণা করি। আপনাব বিরুদ্ধে আমাদের কোন ক্ষোভ নেই। আপনি কি করবেন?

সেই দুর্ভাগা বমণী চীৎকার করে উঠলেন—স্যাম। স্যাম, আমি তোকে হত্যা করব। নিজের হাতে সন্তান হত্যা করব। শূন্যে দুর্বল মুঠি উঠিযে আস্ফালন করলেন তারপর উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে দোরেব দিকে তাকিযে বইলেন।

মিসেস রাউ বললেন—চলুন, আপনাকে বাড়িতে বেখে আসি, আপনি বড ক্লান্ত।

- আমি নিজেই যেতে পারব।

মিসেস বা উ সজোরে ওঁর হাত দুটি চেপে ধরে বললেন, না, তা হবে না, আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

এই বলে মিসেস বা উ মাদামকে বাড়ি নিয়ে চললেন। একটু যেতেই কা মাই-এর সঙ্গে দেখা হল। মিসেস বা উ বললেন—মাকে নিয়ে যাও সাবধানে। উনি আবার মূর্ছিত হয়েছিলেন।

মাকে বিছানায় শুইয়ে কা মাই মেঝেতে বসে পড়ল। তারপর নিজের বিছানায় বসে বসে সু-র কথা ভাবে। সামান্য কাল আগে গুহার ভিতরকার ঘটনা মনে পড়ে, আর তার অন্তর স্যামের প্রতি ঘৃণায় ভরে ওঠে।

সেই ভাবেই চুপচাপ বসে রইল কা মাই, ক্রমে ভোর হয়ে এল, চাঁদের আলো ম্লান হয়ে এল, মুরগী ডেকে উঠল। কা মাই উঠে দাঁড়িয়ে মিসেস হাই থেপের বাড়ির দিকে চলল।

কা মাই চলে যাওয়ার একটু পরে ভোর হতেই স্যাম এসে হাজির হল। তার সঙ্গে একজন আর্দালি। এই দ্বিতীয় বার মাকে দেখতে এল স্যাম। ওর মাথায় সেই পর্দা-ওলা কান ঢাকা টুপি, শুধু শুয়ারের মত দুটি চোখ আর চোখের তারা দেখা যাচ্ছে। একদিকে হেলে পড়ে চলছে। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে রইল স্যাম, আরদালি এগিয়ে গিয়ে তার আগমনবার্তা জননীকে শোনালো। স্যাম দেখছে মাটির জালা, বাড়ির চার ধার খোলা, চারদিক থেকে হাওয়া আসছে, ছাউনির অভাব। তালগাছের পাতায় প্রভাতী বাতাস আন্দোলিত। একটি পত্রহীন সজনে গাছের সব ডালে সাদা ফুলের সমারোহ।

কাছাকাছি একটা ডোবা শুকিয়ে গেছে তার একটা দুর্গন্ধে চারদিক ভরে গেছে। জননীর এই বাসগৃহের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে শয়তান স্যাম যেন কিঞ্চিৎ মানবিক অনুভূতি ফিরে পেয়েছে।

স্যাম বাড়ির ভিতর এসে পায়চারী করতে করতে মাকে প্রশ্ন করে— সেনাদের পায়ের চাপে তোমার কি বেশী লেগেছে মা?

কোনো উত্তর নেই।

স্যাম আবার পায়চারী করতে করতে বলে—তুমি কেন ঐসব বজ্জাত মেয়েদের ভীড়ে গিয়েছিলে মা? তুমি না থাকলে ওদের সবাইকে গুলি করে মারা হত। নিজের হাতের ক্ষতটুকু চেপে ধরে স্যাম আবার বলে ওঠে, মেয়েটা কিন্তু ভারী শক্ত মেয়ে, ঐ সু না কি যেন নাম। কেন মিছিমিছি ভিয়েৎকঙদের সঙ্গে মিশতে গেল কে জানে, নইলে এভাবে মরত না। মেগেটা না হয় ছেলেমানুষ, ওর মার তো চুল পেকেছে।

যাকগে— জান মা, গুহাতে যে সব হতভাগারা আছে ওদের মৃত্যু অনিবার্য। আর কদিন! খাবার নেই, জল নেই, একটু কুয়াশা কাটলেই আমি খড়ে লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে ওদেব গুহাব দোরে আগুন জ্বেলে দেব। তখন সবাই সুড়সুড় করে ইঁদুরের মত বেরিয়ে আসবে।

মাদাম কা সোই—সব শুনছেন কিছু বলছেন না। মাঝে মাঝে সন্তানের দিকে তাকাচ্ছেন।

সহসা স্যাম প্রশ্ন করে—কা মাই কোথায় মা?

—গ্রামে গেছে।

বিছানার উপর বসে পড়ে স্যাম বলে জানো মা এইবাব আমরা হোন দাৎ অধিকার করে এখানে একটা ঘাঁটি বসাবো আর এইবার বাবার সমস্ত জমি উদ্ধার করব। যারা বাবার জমিতে চাষবাস করছে ওদেব সবাইকে খাজনা দিতে হবে। বাকী খাজনাও নেব -

মাদাম কা সোই সহসা প্রশ্ন করেন, ওরা এখানে একটা ঘাঁটি বসাবে একেবারে ঠিক নাকি?

—এর চেয়ে সত্যি আর নেই। আমি ঘাঁটি বসিয়ে আমাদের বাড়িটা মেরামত করে নেব। তোমাকে আর কা-মাইকে আর কাজ করতে হবে না। তোমার ঐ হাঁড়ি কলসি গড়া আর কাপড় বোনার কাজের এবার ইতি। আমি তোমাকে গাড়ি করে রাচ গিয়াতে

নিয়ে যাব। আমার স্ত্রীকে বলব কা মাইকে ভালো কাপড়চোপড় কিনে দিতে। ভালো কাপড়চোপড় পরলে মেয়েটাকে ভালোই দেখাবে।

মাদাম কা সোই যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় বললেন বেশ তো, দেখা যাবে তখন!

তারপর সোজা উঠানে চলে গিয়ে তুটি মুরগী টেনে নিয়ে এসে পুত্রকে বললেন--স্যাম তুমি আর তোমার ঐ আরদালি আজ এইখানে খাবে।

স্যামের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল—বেশ তো, তাই হবে।

মার এইবারকার মেজাজটা অনেক ভালো দেখা যাচ্ছে। মাথার টুপিটা খুলে স্যাম বিছানায় গা মেলে দেওয়ার আগে মুরগী তুটির গায়ে লাথি মেবে বলে ওঠে—বেশ পুরুষ্টু মুরগী দেখছি। মুরগী আর রুটি, সেই বেশ হবে—মুবগী রুটি।

স্ফুতির চোটে পকেট থেকে টাকার ব্যাগ বার করে আরদালীকে একটি পিয়াস্ত্রে নোট দিয়ে হুকুম করল—হাই নো যাও, মদ আর কিছু খাবার কিনে নিয়ে এস। ঐ পথের ধারের দোকানটায় সব পাবে।

আরদালি সসম্ভ্রমে নোটটি কুড়িয়ে নিয়ে চলে যায় তারপর আবার ফিরে এসে ও! বন্দুকটা তুলে নেয়।

স্যাম হেসে উঠে বলে--আরে ছোঃ, বন্দুকের প্রয়োজন হবে না, ওরা সবাই গুহায় ঢুকে বসে আছে।

আরদালী চলে গেল। স্যাম পরমানন্দে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। অনেকদিন এমন আরাম আর [illegible] হয়নি।

মাদাম কা সোই একটি মাটির হাঁড়ি উনানে চড়িয়ে দিলেন।

স্যাম নাক সিঁটকে বলে—হোন দাৎ-এর লোকজন এখনও এ সব মাটির জিনিস ভাঁড়-খুড়ি ব্যবহার করে না কি? আমি তোমাকে

এলুমিনিয়মের হাঁড়ি কিনে দেব, জানো মা আমাদের ওখানে কেউ আর মাটির জিনিস ব্যবহার করে না।

মাদাম কা সোই মুরগী মারার উপক্রম করছিলেন, তিনি একবার ছেলের মুখের দিকে তাকালেন, গলাটা কাটার আগে আরও কয়েকটি পালক ছিঁড়লেন—তারপর গলায় ছুরি বসিয়ে দিতেই রক্তের ফোয়ারা মাটির সরায় গড়িয়ে পড়ে। স্যাম দেখছিল এই দৃশ্য, সে বলে ওঠে—ঠিক যেন ওই হারামজাদি সু-মেয়েটার মতো। কাল ঠিক এই দেখেছি।

মাদাম কা সোই-এর হাত থেকে ছুরিটা পড়ে গেল। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাঁর বুক কেঁপে উঠল। তারপর দ্বিতীয় মুরগীটা কাটা হল।

স্যামের মনে ভারী আনন্দ; সে বেশ স্বস্তি অনুভব করছে।

হাই নো এমন সময় দুই পাত্র মদ্য নিয়ে ফিরে এল। এদিকে খাবারও তৈরি হয়ে গেছে। মুরগী দুটি দেখে জিভে জল আসে।

একটি কাঠের ডিসে সেই সদ্য রাঁধা মাংস ঢেলে ওদের দুজনকে পরিবেশন করা হল।

মাদাম নিজে খুব কমই খেলেন কিন্তু মদ্য পান করলেন প্রচুর। পুত্রের সঙ্গে একত্রে ভোজন এই একবারই ঘটল।

মদের পাত্র অচিরেই শেষ হল কিন্তু একটু মুরগীর মাংস পড়ে রইল। মাদাম বললেন ওটা তোমার বোনের জন্য থাক।

আরদালী হাই নো তখনই ঘুমিয়ে পড়ল। কয়েক মিনিট স্যাম আবোল তাবোল বকে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

কাঁপতে কাঁপতে মাদাম স্যামের হ্যাটটা তুলে ধরলেন। এই সেই মুখ, একদিন বুকে চেপে কত চুমা খেয়েছেন এই মুখে। এই ঠোঁট ওঁর বুকের মধু পান করে বড় হয়েছে। কিন্তু এই কি ওঁর সন্তান? ওকে যেন চেনা যায় না।

চাষীদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে ও বাড়ি বানাবে। ওর

মাকে যে সাহায্য করেছে সেই মেয়েটিকে কাল নিজের হাতে খুন করেছে। ঠিক যেন মুরগী জবাই করছে এমনই ওর মুখের ভাব।

স্যামের মা কুমোরের কাজ করে জীবন ধারণ করে। আর সেই মাটির কাজের ও নিন্দা করে। এই রকম ভাঁড়-খুরি বানায় বলেই ওর মা দুবেলা খেতে পায়।

মাঝে মাঝে মা বোনের দিকে তাকায় বটে কিন্তু তার মূল্য কি? এই মানুষটির মধ্যে মাদাম কা সোই-এর পুত্র কোথায়?

মাদাম হাতের ছুরিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন।

এরই কয়েক মিনিট পরে দুজন গেরিলার ছায়া বাড়ির খিড়কির দোরে পড়ল। একজন গেরিলা দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল গ্রেনেড হাতে নিয়ে পাহারাদার হয়ে, আর অপর জন ভিতরে ঢুকে স্যামের গলায় ছুরি বসিয়ে দিল। আওয়াজ শুনে আরদালিটা অটোমেটিক টেপবার উদ্যোগ করতেই তাকেও শেষ করা হল। কান থেকে কান পর্যন্ত টানা লম্বা আঘাত, সে আঘাতে কেউ বাঁচে না।

রক্তে ঘর ভরে গেল।

নারকেল গাছের মাথায় মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণ পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত। আঁটি আঁটি খড় এবং গুঁড়োকরা চুন এবং লঙ্কার ওপরও সেই আলো পড়েছে। এই লঙ্কা আনা হয়েছে নদীর ওপার থেকে, তারপর সেগুলি এখানে ঝোপের পাশে জড়ো করে রাখা হয়েছে।

স্যামের ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট বা হুকুম দিল—এই সব খড় আর চুন ও লঙ্কার গুঁড়ো একেবারে গুহার মুখে নিয়ে গিয়ে রাখো। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। দুটি মেশিন

গান হাতে থাকা সত্ত্বেও লোকগুলি চোরের মত লঘু পায়ে অগ্রসর হচ্ছে। ওরা যখন ওপরে উঠল তখন শুধু খড়ের বোঝা ওপরে উঠছে মনে হল। গুহামুখের দুই পাশে খড়ের যেন হলদে দুটি সরল রেখা টানা হল। যারা লঙ্কা ও চুনের থলি বয়ে আনছিল তারাও এসে পড়ল। সবাই একটু ঘুর পথে এল পাছে গেরিলারা কেউ দেখে ফেলে এই ভয়।

সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট আর এক দল সৈন্যকে লম্বা দুটি বাঁশ দিয়ে পাঠালেন। সকালে সেগুলি কাটা হয়েছে, সমুদ্র উপকূলস্থ বাঁশঝাড় থেকে। অনেক লোক ভীড় করে এসেছিল কম্যাণ্ডারের বাড়ি প্রতিবাদ জানাতে। বাঁশের জন্য বেশ কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হল।

বা তার দলবলের সঙ্গে যোগ দিয়ে একজনকে পাঠাল স্যামকে খবর দিয়ে ডেকে আনার জন্য। নিজের হাতে থলির মুখ কেটে লঙ্কার গুঁড়ো এবং চুন সেই খড়ের আঁটিতে ফেলা হল আর তারপর লম্বা বাঁশ দিয়ে সৈন্যরা সেগুলি গুহার মুখে ঠেলতে লাগল। গুহাবাসীরা বন্দুক ছুঁড়ল প্রতিরোধের প্রচেষ্টায়। সঙ্গে সঙ্গে খড়ের আঁটিতে আগুন ধরে গেল।

সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট অট্টহাস্য করে উঠলেন। ভালোই হল। আমাদের আর কষ্ট করতে হল না। ওরা নিজেই আগুন ধরিয়েছে। তোমরা শুধু লক্ষ্য রাখো আগুনটা না নেভে।

সেনারা তৎক্ষণাৎ গুহার প্রবেশ পথের সবখানি জায়গা জ্বলন্ত খড় দিয়ে ঘিরে দিল। শুকনো খড়ের আগুন তৎক্ষণাৎ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

অফিসারটির ভারী আনন্দ। বলে—যত সব কুত্তার বাচ্চা। এইবার গর্তের ইঁদুর বেরিয়ে পড়বে, তারপর ওদের সবাইকে কাটব। বুঝলে—

গুহার ভিতর থেকে গুলি ছোঁড়া বন্ধ হয়ে গেছে। সেকেণ্ড

লেফটেন্যাণ্ট মাটিতে বুক দিয়ে শুয়ে পড়েছেন। মেশিনগানের নলের মুখটা গুহার মুখ লক্ষ্য করে বসানো।

লেফটেন্যাণ্ট বলছেন -কুত্তার বাচ্চারা এইবার বেরিয়ে আসবে। চালাকী নয় বাবা, এর নাম লঙ্কার ধোঁয়া। সহসা গুহার কাছাকাছি যে সব সৈন্যরা দাঁড়িয়েছিল তারা লাফিয়ে পালিয়ে এল।

অফিসার প্রশ্ন করলেন—ব্যাপার কি!

উত্তর না দিয়ে সেনাদল ভীষণ কাশতে থাকে। ধোঁয়া কিছুতেই গুহার ভিতর ঢুকছে না, ভিতর থেকে একটা প্রচণ্ড হাওয়া এসে সেই ধোঁয়াকে সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে সেনাদল সবাই কাশছে, হাঁচছে, কাঁদছে, সে এক বীভৎস ব্যাপার। অনেকে এই ধোঁয়ার ঠেলায় মাটিতে অচেতন হয়ে পড়ে গেছে। অনেকে আবার চোখ খুলতে পারছে না, অন্ধের মত চারপাশ হাতড়াচ্ছে।

বা তো ক্ষেপে আগুন। নিজেই দেখতে ছুটল ব্যাপারটা কি। কিন্তু তার মুখেও ধোঁয়া এসে লাগল। গুহার ভিতর বায়ুর চাপ বেশী থাকায় গুহার বাইরের ধোঁয়া সেখানে প্রবেশ করছে না।

পরদিন সকালে গ্রামের লোকজন যখন শুনল সৈন্যদলের মতলব কী ভাবে ফেঁসে গেছে তখন সবাই বিদ্রূপের হাসি হাসল। বুড়ো তু দোনের কাছে সেনারা যখন খড় নিতে এসেছিল তখন বুড়ো ফোক্‌লা দাঁতে একগাল হেসে বলেছিল -বেশ তো যত খুসী নাও। আমার এক পয়সাও খরচ হয় নি। শুধু তোমাদের কাজে লাগবে মনে হয় না।

-কি বুড়ো? তার মানে কি গো?

—গুহার ভিতর ধোঁয়া ঢোকানো অসম্ভব।

আরেকজন সৈনিক আলাপচার থামিয়ে বলল- চল চল, আমাদের ওপর যা হুকুম তাই করি, এই কানা বুড়োটার সঙ্গে গল্প করে কি লাভ বল?

তু দোন কিন্তু ঠিকই বলেছিল।

শেষ পর্যন্ত সেকেণ্ড লেফটেন্যান্টকেও বলতে হল—না, কোন আশা নেই দেখছি। গুহার মুখে খড় গুঁজে দিয়ে পালা।

চারজন সেনা অনেক সাবধানে হুকুম তামিল করাব জন্য এগিয়ে লম্বা বাঁশ দিয়ে খড় ঠেলে দিতে দিতে বলল- -

--কানা বুড়োটা ঠিকই বলছিল। এ ভাবে হয় না। আরেকজন বলল—লেফটেন্যান্ট, এখানে আমবা গেরিলাদের একেবারে মুখোমুখি আছি। এখন চলুন সরে পড়ি। কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যাক।

রেগে আগুন হয়ে সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট বললেন যত সব গন্দ বোকা নিয়ে আমার কাজ। ওরা যদি আসে তো ভালোই হবে। তাদের মুণ্ডু ছিঁড়ে খাবে। ওসব হবে না—এখান থেকে হটবো না কিছুতেই।

এরপর আর একটি অশ্লীল গালাগালি উচ্চারিত হল। ঠিক এই সময় যে লোকটিকে স্যামের কাছে পাঠান হয়েছিল সে ফিরে এল হাঁফাতে হাঁফাতে। তার মুখ চাক্-এর মত শাদা, একটু দম নিয়ে সে বলল- লেফটেন্যান্ট সাহেব খুন হয়েছেন—

বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে বিবাট হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট।

সৈনিকটা বলতে থাকে—আর্দালী হাই নো-টাও সেই সঙ্গে খুন হয়েছে। ছোরা বা অন্য কিছু দিয়ে খুন করা হয়েছে। লেফটেন্যান্টের মাথাটা কাটা। যে বিছানায় শুয়ে আছেন বিছানাটা রক্তে ভাসছে।

—কোথায় খুন হল, কেই বা খুন করেছে? কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে নাকি?

—লেফটেন্যান্টের মার বাড়িতে এই কাণ্ড ঘটেছে। কে যে করেছে তা জানি না। আমি গিয়ে দেখি দুজনে একেবারে রক্তে ভাসছে—মাছির বৃন্দাবন। বাড়িতে কেউ কোথাও নেই।

—বেজন্মার দল। এখন থেকে খুন-খারাপি সুরু হল।

- নিশ্চয়ই—

সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট ভয়ে কাঁপছেন, বললেন—কম্যাণ্ডার সাহেবকে রিপোর্ট দিয়েছ ?

—হ্যাঁ লেফটেন্যাণ্ট।

—কি বললেন ?

—তিনি মদ খাচ্ছিলেন। হাত থেকে গ্লাসটা পড়ে গেল।

আর কোন প্রশ্ন না করে সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট সব কাজ থামাতে নির্দেশ দিলেন। সেনারা সব বাঁশের লগাগুলি ফেলে দিয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল।

স্যাম ওদের সবাইকে একেবারে পিশাচ করে তুলেছিল। সবাই ভাবত স্যামের জন্যই ওরা লড়াই জিতবে। যাকে খুসী মেরে ফেলেছে, ভুঁড়ি ফাঁসিয়েছে। সব অপরাধের সর্দার ছিল স্যাম। বিপ্লবীদের দেখলে সে যেন রেসের ঘোড়ার মত এগিয়ে যেত—এমন কি ধান ক্ষেত বা একবুক জল ভেঙে ও ছুটত। জল ঝড় কিছু গ্রাহ্য করত না। তার ধারণা ছিল এইভাবে হঠাৎ আক্রমণ করেই ভিয়েৎকঙদের ঠাণ্ডা করা যায়। কোনো দুর্ভাগা স্ত্রীলোককে হত্যা করে স্যাম তার স্তন কামড়ে রক্ত টেনে বার করত—তাতেই তার তৃপ্তি। সেই যেন তার কাছে টনিক।

এই ছিল স্যাম, ন্গো দিন দিয়েম আর পাঁচজনের অন্যতম করে তাকে সম্মানিত করেছিল "হিরোস অব দি ফোর্থ আর্মি কোর"—চতুর্থ বাহিনীর বীর নায়ক। স্যামের সেনাদল ছিল বিষধর সর্পবৎ, সে ছিল সেই সাপের মুখ।

এখন সবাই ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে সেই দুর্দান্ত স্যামের এই পরিণতির কথা ভেবে।

উপসংহার

--বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি পড়ছে। জল জল জল। এই সংবাদ বৈদ্যুতিকবেগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। গুহার সকলে জানল বৃষ্টি পড়ছে।

থান আর বে দুজনে উঠে বসে বাতি জ্বালায়। শুনতে পেল সবাই চেঁচাচ্ছে। গুহার ফাটল দিয়ে মূল্যবান জল গড়িয়ে পড়ছে।

নাম নো আলো ধরে আছে, আর কোয়েন সেই বিন্দু বিন্দু জল জালায় ভরছে।

বাইরে বৃষ্টির আওয়াজ যেন জলতরঙ্গের সুরে বাজছে। পরে গুহার গা বেয়ে প্রবলবেগে জল পড়তে থাকে. এই জল অনেক পরিষ্কার। কোয়েন মাথা না তুলে জল ভরছে তার জালায়।

জালাটা ক্রমে বেশ ভারী হয়ে এল। কোয়েন দেখলো মাত্র অর্ধেক ভরেছে। সে মৃদু গলায় বলে আর তেমন চেষ্টা নেই।

নাম নো প্রস্তাব করে--ধরে থাকার কি দরকার, মাটিতে বসিয়ে রাখনা।

কোয়েন মাটিতে জালাটা বসিয়ে দিয়ে তার সেই সুন্দর দুটি চোখ মেলে চারদিক দিয়ে কেমন জল ঝরছে তাই দেখে। সে বলল

---আজ আমাদের দুটি জয়লাভ ঘটল বিনা ক্লেশে। বাইরে বোধ হয় প্রলয় হচ্ছে।

—নিশ্চয়ই।

—আকাশ আমাদের ওপর সদয়। এখন সব দুঃখ শেষ হল। আর ভাবনা নেই। আমাদের ভাত আছে। জল আছে। এখন দেখা যাক কি ভাবে ওরা আমাদের এখান থেকে হটায়।

—নিশ্চয়ই।

—আকাশ আমাদের ওপর সদয়।

—তবে সবাই ভয় পাচ্ছে ওরা হয়ত বাইরে থেকে ডিনামাইট দিয়ে ওড়াবার চেষ্টা করবে।

—তাতে কোনো লাভ হবে না। আমরা একটু ভেতরে চলে যাব। গুহাটা তো কম লম্বা নয়। তারপর আবার সামনের দিকে চলে আসব। সেদিন যখন হাঙ্গাবটা গ্রেনেড ফাটিয়েছিল, মনে নেই।

এইবার জালাটা পূর্ণ হয়ে জল উপচে পড়ছে। নাম নোর হাতে একটা প্লাষ্টিকের ব্যাগ ছিল, সে সেই ব্যাগটির মুখ ফাঁক করে যতটা পারল জল ভরে নিল।

কোয়েন বলল—নাম নো। যাও রান্নাঘরের সব পাত্রগুলি নিয়ে এসো, ভরে নিই।

কিছুক্ষণ পরে নাম নো ফিরে এসে বলল, সে সব ভরে গেছে। পুরুষরা সে কথা আগেভাগে ভেবে কাজ করেছে।

কোয়েনের ভারী দুঃখ এতখানি জল নষ্ট হচ্ছে। সে হাঁ করে কিছু জল পেট ভরে খেয়ে নেয়। তারপর নাম নোকে বলে, এখন তুমি নাও।

এই বলে কোয়েন বলল, দাঁড়া আর সবাইকে ডেকে নিয়ে আসি।

ক্রমে বৃষ্টি কমে এল।

নাম নো বলল, বৃষ্টি থামছে, চলো আমরা এখন কাপড় ছেড়ে ফেলি।

কোয়েনের কিছু বৃষ্টির জল তখনও ছাড়তে ইচ্ছা নেই।

কোয়েন মুখের জল মুছে ওর শোবার জায়গায় কাপড় বদলাতে গেল। দেখল সেখানে থুয়ার গলায় হাত দিয়ে নাগান শুয়ে আছে।

সে বলল—নাগান, আমার সিল্কের পোষাকটা দাও তো।

-স্নান করলে নাকি? বেশ ঠাণ্ডা তো?

ঠাণ্ডাই তো ভালো।

নাগান তাড়াতাড়ি পোষাকটি এগিয়ে দিয়ে বলে—নাও পোষাক পাল্‌টিয়ে নাও। ঠাণ্ডা লেগে যাবে। এখন সাবধান হওয়া দরকার।

কোয়েন নীরবে পোষাক বদলায়। ভিজা জামা কাপড় নিঙড়ে সেগুলি পাঁচিলের গায়ে শুখানোর জন্য মেলে দেয়। নাগানের পাশে পাথরে বসে চুলগুলি শুখানোর জন্য মেলে দেয়। নাগান ধীরে ধীরে থুয়ার গা থেকে হাতটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর কোয়েনের চুলগুলি আল্‌তো ভাবে আঁচড়ে দেয়।

কোয়েন চুপ করে বসে আছে। ছায়ার দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়ল—

নাগান সান্ত্বনা দিয়ে বলে ছিঃ কোয়েন, অমন করে আর কেঁদো না। আমি তো তোমাকে বলেছি—

—জানো, একটা কথা ভেবে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সু তার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেছে দীর্ঘদিন। তার এতটুকু ক্লান্তি ছিল না। আজ সকালে ওর জামার পকেটে একটা চিঠির টুকরো পেলাম— প্রিয়তম, তোমার চিঠি পেলাম—

শুধু এই পর্যন্ত। আর লেখেনি।

-- তুমি সেটা দিয়েছ তো!

নাগান সুর স্বামী দানের কথা ভাবে। সে এই সংবাদ পেলে কি করবে! এই ভাবে দেশ বিভাগের ফলে দেশের অনেক তরুণীরই আজ এই অবস্থা। সবাই প্রতীক্ষায় বসে দিন গুনছে। অবশেষে সে বলে—জানো কোয়েন, সু-র মৃত্যু বীর রমণীর মৃত্যু। সে এক বীরাঙ্গনা।

- তা বটে, তবু তার জন্য দুঃখ না হয়ে পারে না।

—সবাই দুঃখিত। তবে তোমার দুঃখটা বেশী, সেটা স্বাভাবিক। আজ কাঁদ, কিন্তু কাল-

— কাল— ? কাল আর কাঁদব না।

— শত্রু যে কোন সময় ঝাঁপিয়ে পড়বে, এখন কি চোখের জলের সময়?

—আমার কি ভয় হয় জানো। ওরা বোধ হয় সুর মৃত্যুর খবর পেয়ে যাবে।

-দু-একদিনের ভেতর জেনে যাবে। কেউ আটকাতে পারবে না। তবে শত্রুরা চলে গেলে সে খবর জানলে ভালো হয়।

কোয়েন নীরব। সে অন্যমনস্কভাবে নাগানের কাঁধে চুমা খায়। বলে- তুমি খালি আমাকে ধমকাও।

—যা। মিথ্যে কথা।

বা, এই তো বক্‌লে।

নাগান হেসে উঠল—তুমি ছোট কিনা তোমার মা তাই আদর দিয়ে তোমার মাথাটি একেবারে খেয়েছে। আমি তোমাকে কখনও একটু ধমক দিইনি। অন্ততঃ ধমকের মত কিছু নয়।

তুমি তো তাই বলবে, তবে আমি তোমাকে উত্তমরূপে চিনি।

হেসে নাগান বলে বেশ, এখন ঘুমোও। কালই আবার শত্রুরা হানা দেবে। ঠিক এক সপ্তাহ কাটল।

--মনে হয় যেন কত দিন, অনেক অনেক দিন।

—তার কারণ আমরা শেষ হওয়ার প্রতীক্ষায় আছি।

ঠিক তা নয়। এর কারণ গত ক'দিনে অনেক কিছু ঘটে গেছে। সাত দিনে যেন সাতটি বছর কেটে গেল।

- কথাটা ঠিক। দেখো মাত্র সাত দিন। ভেবে দেখ সাউথ ভিয়েৎনামে গত সাত বছরে কত না মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটেছে। আত্মত্যাগ, ঘৃণা আর বীরত্ব···

আমি এই কয় রাত্রি ঘুমোতে পারিনি মোটে।

বেশ এখন একটু ঘুমিয়ে নাও। আমাকে এখন অন্যদের কাছে যেতে হবে। বৃষ্টি বোধ হয় থেমে গেছে এতক্ষণে।

কোয়েন কান পেতে শোনে। এখন আর বৃষ্টি পড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। পাহাড়ের গা বেয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। নাগান কোয়েনকে জড়িয়ে ধরে চুমা

খায় কিন্তু বাতি জ্বলে উঠে নিভে যেতেই সে তাকে ছেড়ে সহসা বেরিয়ে গেল।

কিছু পরে উট কোয়েনের কাছে এসে হাজির হল।

—দিদি, ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?

—না উট ঘুমোই নি ভাই। এই বলে কোয়েন হাত বাড়িয়ে উটকে সেই উঁচু টিলায় উঠিয়ে নেয়। ছেলেটার হাত দুটি ঠাণ্ডা, কাপড় ভিজে, মাথার চুলও ভিজে রয়েছে।

উট প্রশ্ন করে—দিদি তুমিও স্নান করলে নাকি?

—হ্যাঁ।

—খবর শুনেছ? গ্রাম থেকে খবর এল কে যেন স্যামের মাথাটা কেটে ফেলেছে।

কোয়েন অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করে সে কিরে? তুই কি করে জানলি?

—কা-মাই এখনই কিছু ভাত এনে পৌঁছে দিল, তুমি জানোনা বুঝি?

— কা-মাই? কোথায় সে?

— একটু আগে চলে গেল। জানো যখন এসেছিল না তখন একেবারে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। সেই বলল আমাদেরই গেরিলা-দলের কেউ স্যাম আর আর্দালিকে কেটেছে। ওর মা কোথায় পালিয়েছে। তারপর কা-মাই এর যে কি কান্না। কেন ঠিক বুঝলাম না। সৈন্যরা বোধহয় ওর ওপর কোনো অত্যাচার করে থাকবে।

—তুমি কা-মাইকে দেখেছ?

—বা রে! আমি তো সেখানেই ছিলাম। সেই বৃষ্টির মধ্যে শোনা গেল কে চীৎকার করে ডাকছে—দাদা আমি এসেছি, আমি কা-মাই।

আমিও আর সকলের সঙ্গে বেরিয়ে দাঁড়ালাম। কা-মাই কিছু

খাবার জিনিষ গুহার ভিতর রেখে দিয়ে তার কি হয়েছে সে সব বলল, তারপর হাউ-মাউ করে কাঁদতে লাগল। যখন সে চলে যাচ্ছিল তখন বিদ্যুৎ চমকালো, আমি স্পষ্ট দেখলাম ওর জামা কাপড় ছিঁড়ে অষ্টকুটি হয়ে গেছে।

উট অতি দ্রুত কথা বলছিল আর বার বার বলছিল সে একবর্ণও মিথ্যা বলছে না। তারপর কোয়েনের হাত দুটি ধরে বলে -বেশ তুমি আমার কথা বিশ্বাস না করো তো আমার সঙ্গে চলো।

কোয়েন টিলা থেকে নেমে উটের সঙ্গে চলল। উটও দ্রুতপায়ে চলল। পথে হাই পেপের সঙ্গে দেখা, কোয়েন প্রশ্ন করে এখনই কা মাই এসেছিল নাকি।

হ্যাঁ, কিছু খাবার আর তামাক দিয়ে গেল। শুনেছ তো স্যামের দফা শেষ।

—সত্যি? উটের কথা আমার বিশ্বাস হয়নি।

—কথাটা সত্য। আর মাদাম কা সোই নিরুদ্দেশ।

— উনি নিশ্চয়ই আমাদের বাড়িতে আছেন।- বলল উট।

তোমার এ কথা মনে হল কেন?

- লুকানোর পক্ষে চমৎকার জায়গা, তাই বলছি। নিশ্চয়ই ওখানেই আছেন আর ওরা কিছুতেই ওঁর সন্ধান পাবে না। উট চুপ করল।

হাই পেপ কোয়েনকে বলে—আহা বেচারী কা মাই! মনটা একেবারে খাঁটি সোনা। কি আশ্চর্য মেয়ে। জানো কোয়েন ও যখন কাঁদছিল আমি জানতে চাইলাম কি ব্যাপার? মেয়েটা শুধু বলল না খুড়ো এখন নয়। পরে শুনবেন। আপনারা গুহা থেকে বেরিয়ে আসার পর বলব। তারপর যেমন তাড়াতাড়ি এসেছিল তেমনই দ্রুত পায়ে পালালো।

কা মাই-এর যে কি হয়েছে তা বুঝতে পারল কোয়েন। নিজের আঙুলটা কামড়ায় কোয়েন। তার চোখে জল। কোয়েনের মনে পড়ল

ঝরণার পথে যাওয়ার সময় কা মাই কি ভাবে হাসত আর 'রাজপুত্র ও দৈত্য' নামক পদ্যটা সে গান করে শোনাত।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঝরণায় যাবার সময় সে মাটির কলসীটা নামিয়ে রেখে নিজের খুসীমত নানা রকম নাচ দেখাত। ঠিক সেই মুহূর্তে বিশ্বস্ত, সরল, উত্তাপ উত্তেজনায় পরিপূর্ণ কা মাই-এর কথা মনে পড়ে। কি রকম শব্দ করে সে কোয়েনকে চুমা খেত।

আজ কা মাই-এর কথা ভেবে কোয়েনের মনটা বেদনায় ভরে যায়। কা মাইকে সেনারা অসম্মান করেছে। তবে সবটুকু বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না, সেই হাই-থেপকে বলে—

না-না এ হয় না, সবটা হয়ত ঠিক নয়। তবে সন্দেহ রয়ে গেল। মনের কোনে একটা ব্যথা জেগে থাকে।

তাম চেনের গোপন গর্ভগৃহের দরজায় তিনবার পা দিয়ে কে ধাক্কা দিল। এই ধরণের ধাক্কা একটা ইঙ্গিত। তাম চেন বুঝলো কে এসেছে, সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেয়

মিসেস হাই থেপ এসেছে। হাই থেপ গিন্নী মাটিতে বসে মৃদু গলায় বলে—একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে।

—কি হল আবার ?

—কা মাই তু রাউ-এর বাড়ি থেকে এসে বলল তু রাউ নাকি মাছ ধরতে গিয়ে একটা জলে ডোবা সৈনিকের মৃতদেহ সমুদ্র থেকে ডাঙায় তুলেছে।

রেগুলার না আর্মড পুলিস ?

রেগুলার। ইউনিফর্ম পরা, পেটে আঘাতের চিহ্ন। আমাদের সন্দেহ হয় যে সব আহত সৈনিকদের হেলিকপটারে করে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে এ তাদেরই একজন।

এই কথা শুনে তাম চেন মাটির নীচে থেকে উপর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—দেহটা কি এখনও তু রাউ-এর বাড়ি আছে ?

—হ্যাঁ।

তাম চেন একটু ভেবে নেয়, তারপর বলে—সত্যি দুদিন আগে আহতদের হেলিকপটারে করে সরানো হয়েছে। এ নিশ্চয়ই তাদেরই একজন। তবে এ বিষয় নিশ্চিত হতে হবে। সেনাদলেই খোঁজ নাও। বরং রেগুলার আর্মির কাছে সন্ধান নাও। যদি তারাও এই কথাই বলে তাহলে দেহটা গ্রামের ভিতর নিয়ে যাও। যতটা সম্ভব খোলাখুলি ভাবে নিয়ে যাও, যাতে সকলের মনে চমক এবং আঘাত লাগে। এর ফলে সৈন্যদলের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্রোধ বাড়বে। সৈন্যদের মধ্যে প্রেরণা দাও যে জনগণের সঙ্গে তারা যোগ দিক, দিয়েনের দালাল আর ইয়াঙ্কিদের প্রতি সেনাদলের মনে ঘৃণা জাগিয়ে দাও। এর ফলে ওদের মনোবল ভাঙবে। ওরা বাধ্য হয়ে দলত্যাগ করবে।

—ঠিক বলেছ ভাই। তাই হবে।

যতটা পারো ভালোভাবে ব্যাপারটা সম্পন্ন করবে। কোনো মতেই লাসটা যেন ওরা কেড়ে নিতে না পারে।

—আমি এখনই যাচ্ছি। কয়েকজন সৈনিকের সঙ্গে দেখা হল, ওরা গুহার প্রবেশ পথ পাঁচিল দিয়ে এঁটে ফিরছিল। মনে হল স্বয়ং কম্যাণ্ডার দাঁড়িয়ে এই কাজটা করাচ্ছেন।

—তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে যে কাজটা বললাম তাই করো। গুহার মুখে পাঁচিল এঁটে সীল করা এত সহজ ব্যাপার নয়। তাছাড়া তোমাদের এই অভিযান যদি সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারো তা হলে কম্যাণ্ডারকেও গুহার মুখ থেকে পালিয়ে আসতে হবে। ওপরওলার ডাক পাঠাবে। কম্যাণ্ডার হলে কি হয়, নিষ্কৃতি নেই।

মিসেস হাই থেপ রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে এসে তাম চেনে হাতে দিয়ে বললেন—এটা রেখে দাও। আমার সব কাজ সেরে ঠিক সময়মত হয়তো আসতে পারব না।

তুমি সকালে কি খেয়েছ ?

—সে সব ভাববার সময় কোথায়? এখন যাই। সাবধানে থাকবে। লক্ষ্য রাখবে ঠিকমত ইঙ্গিত না পেলে কিছুতেই দরজা খুলবে না।

মিসেস হাই থেপ ঠিকই বলেছিলেন কম্যাণ্ডার স্যাং সকাল থেকে গুহার প্রবেশপথ বন্ধ করার কাজে ব্যস্ত। গুহার মুখে কাজে ব্যস্ত থাকলেও গায়ে যাতে গুলি এসে না লাগে সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক হয়ে আছেন। প্রায় দশ ফুট দূরে বসে তাঁর তাঁবেদারদের কাজকর্ম তদারক করেন. দেখছেন গ্রেনেড ঠিকমত চালানো হচ্ছে কিনা। গ্রেনেড চালাবার আগেই দুজন সৈনিককে প্রতিরোধকারীর দল সাবাড় করেছে। সেই সঙ্গে তাদের হাতের গ্রেনেড ফেটে গিয়ে আশেপাশের আরো চারজনকে খতম করেছে। সৈন্যরা সিমেণ্টের বস্তার পাশে আড় হয়ে শুয়ে আছে, আর বেশী আত্মপ্রকাশে ভরসা নেই।

স্যাং মাথা চুলকায়, তার মাথায় হেলমেট নেই। দলের লোকদের আবার আক্রমণ করতে বলে মাটিতে শুয়ে পড়ে। এইবার গুহার দিকে চার-পাঁচটি গ্রেনেড ছোঁড়া হল।

বেটন উঁচিয়ে কম্যাণ্ডার হাঁকছেন এট্যাক— আক্রমণ চালাও।

কিন্তু সব বৃথা।

গেরিলারা গুহার আরো ভিতর দিকে সরে গেছে।

এমন সময় সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট সানহ প্রাণপণে দৌড়ে এসে হাজির। মনস্তাত্ত্বিক বিভাগের কর্মী এই সানহ। সে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—কম্যাণ্ডার সৈন্যরা বিদ্রোহ করছে, অবস্থা কাহিল—

যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। কি বলতে চাস বল।

—কম্যাণ্ডার—

কি বলবি বলনা পাঁঠা কোথাকার

ওরা সমুদ্র থেকে একটা সেপাই-এর মৃতদেহ উদ্ধার করে মিছিল বের করেছে।

সেপাই।

—হ্যাঁ কম্যাণ্ডার, রেগুলার ষ্টাফদের একজন। সারা গাঁ থানায় দেহটা ঘোরাচ্ছে। আমাদের লোক দেখতে গিয়েছিল, গার্ড কোম্পানীর লোকরা দেখে বলে অসল এটা সাউ হোনের মৃতদেহ। সাউ হোনকে সমুদ্রে এইভাবে ডোবা অবস্থায় দেখে ওরা একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। একেবারে লেজেগোবরে অবস্থা। ওরা বলছে আহত সেনাকে এইভাবে ইচ্ছে করে সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।

কম্যাণ্ডার সাহেবের মুখ শুকিয়ে চুন, প্রশ্ন করে তুমি নিজের চোখে দেখেছ? সত্যি ও তৃতীয় বাহিনীর সাউ হোন নাকি?

হ্যাঁ, নিজের চোখেই দেখেছি। এই সেই

স্যাং চারদিকে উন্মাদের মত ঘুরপাক খেয়ে বলে—তারপর কি দাঁড়াল বল।

তারপর অন্যসব কোম্পানীর মধ্যে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই গাল পাড়ছে, সবাই বলছে হোনের দেহ কি করে জেলের জালে গিয়ে আটকাতে পারে। ওকে ইচ্ছে করে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ভালো কথা, চারজন সিভিল গতরাত্রে পালিয়েছে।

এখন এই সব কথা বলে আমার মাথাটা খারাপ করে দেবে নাকি? কি ভেবেছ তুমি।

কি করি। সত্যি সে পালিয়েছে।

—যতসব বেজন্মার দল। এখন এই মরা সৈনিকের ব্যাপারটার কি অবস্থা বলো?

এ এক বিরাট বিপর্যয়। কোনো কোনো সৈনিক তাঁবু পুড়িয়ে ফেলছে, কেউ নদীর জলে রাইফেল ভাসিয়ে দিয়েছে তারপর ঐ মিছিলে সামিল হয়েছে।

কম্যাণ্ডার টু-র দিকে ফিরে তাকিয়ে চীৎকার করে বলে—তাড়াতাড়ি দেয়াল গেঁথে ফেল। দেখি ওদিকে কি ব্যাপার।

টু হলো ইঞ্জিনিয়ার দলের লেফটেন্যাণ্ট। তারপর প্রশ্ন করে—তুমি কোথায় ছিলে? বাধা দাও নি কেন?

—কম্যাণ্ডার আমি অনেক পরে খবর পেয়েছি।

—এ সব ভিয়েৎকঙদের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।

– হ্যাঁ স্যার, তবে মড়াটা কিন্তু একেবারে খাঁটি।

—দেহ, মুখ চোখ সব অক্ষত আছে?

– একটু-আধটু এদিক ওদিক হলেও হোনকে এক নজরেই চেনা যায়। সমুদ্রের লোনা জলে দেহটা ঠিক আছে।

স্যাং নীরবে পায়চারি করে। তারপর সহসা চীৎকার করে ওঠে—যত সব বেজন্মার দল। প্রেসিডেণ্ট নগো দিন দিয়েম নিজেই বলতে পারবেন না এদের নিয়ে কি করা যায়। মরুকগে, এখন গ্রামের লোকদের কোনোমতে উত্তেজিত করে খেপিয়ে দিয়ো না যেন।

—তা বটে, কিন্তু সৈন্যরাই যে মিউটিনি করে বসেছে।

স্যাং চীৎকার করে ওঠে—যে প্রথম বন্দুক ত্যাগ করবে গুলি করে তার খুলি উড়িয়ে দেবে।

সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট নিরুত্তর।

নারকেল কুঞ্জ দিয়ে যেতে যেতে যে দাঁড়তে সুকে ঝোলানো হয়েছিল সেই দিকে তাকিয়ে সে বলে ওঠে সেই মেয়েটাকে ফাঁসিতে লটকানোর পর থেকেই যত বিপদ। আমাদের উচিত ছিল--

গলার স্বর নকল করে কম্যাণ্ডার বলে কি উচিত ছিল?

– একটু সময় হাতে নিয়ে কাজটা করলে হত। মেয়েটাকে এখানে সবাই ভালোবাসত। অন্ততঃ তাহলে লেফটেন্যাণ্ট স্যামকে ওরা হয়তো হত্যা করত না।

– ননসেন্স। যে খুন করেছে সে পাগলী তা জানো।

– না স্যার মাফ করবেন। সে আপনার আমার চেয়েও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ। সে এত সতর্ক যে তার প্রতিবেশী বা ভিয়েৎকঙদের পর্যন্ত আঘাত করেনি—